মানব শারীরতত্ত্ব : সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ
HUMAN PHYSIOLOGY : CO-ORDINATION AND CONTROL

৮
অধ্যায়

পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে যথাযথ সাড়া দিয়ে নিজ নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখা প্রত্যেক জীবেরই একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বহুকোষী জীবের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেহকোষের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ রাখতে কিংবা কাজের নিয়ন্ত্রণে অথবা বিভিন্ন কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধনে স্নায়ুতন্ত্র এবং অন্তঃক্ষরা তন্ত্র উল্লেখযোগ্যভাবে অংশগ্রহণ করে। জীবদেহে বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া যে সৃষ্টি করতে পারে তাকে **উদ্দীপক** বলে। আর উদ্দীপকের প্রভাবে জীবদেহে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় তাকে **উত্তেজিতা** (irritability) বলে। উদ্দীপক দ্বারা সৃষ্ট উদ্দীপনা জীবদেহে সাড়া জাগায়। পরিবেশ থেকে আসা চাপ, তাপ, ব্যথা, বেদনা, স্পর্শ, আলো, শব্দ, গন্ধ, স্বাদ ইত্যাদি নানা রকমের উদ্দীপনা গ্রহণের জন্য এক প্রকার গ্রাহক যন্ত্র থাকে যাকে **রিসেপ্টর (receptor)** বলে। আবার এই রিসেপ্টর থেকে গৃহীত উদ্দীপনা পরিবহনের জন্য প্রাণিদেহে অসংখ্য নিউরন বা স্নায়ুকোষ থাকে। জীবদেহে গৃহীত উদ্দীপনা যার মাধ্যমে মুহূর্তের মধ্যে জীবদেহে ছড়িয়ে পড়ে তাকে **বাহক** বা **সঞ্চারক** (conductor) বলে। প্রতিবেদন অঙ্গ বলতে আমরা বুঝি, দেহের যেসব যন্ত্র বিভিন্ন উদ্দীপনায় উদ্দীপিত হয়। যেমন– বিভিন্ন পেশি ও গ্রন্থি। উচ্চতর প্রাণিদেহে এক বা একাধিক স্নায়ুকোষ দিয়ে গঠিত সাদা বা ধূসর রঙের যে এক রকমের সুতার মতো তন্তু দেখা যায়, তাদের **নার্ভ** বা **স্নায়ু** বলে। প্রকৃতপক্ষে স্নায়ুর সাহায্যেই স্নায়ুস্পন্দন গ্রাহক (receptor) থেকে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে অর্থাৎ নিয়ন্ত্রক কেন্দ্র থেকে প্রতিবেদন অঙ্গে পৌঁছলে তারা উদ্দীপিত হয়। আর এর ফলে প্রাণীরা উত্তেজনায় সাড়া দেয়। রাস্তায় চলতে চলতে পায়ে কাঁটা ফুটলে বা চামড়ায় সুচ ফোটালে আমরা ব্যথা পাই। চোখে হঠাৎ উজ্জ্বল আলো পড়লে চোখ বন্ধ করি। বিভিন্ন অঙ্গতন্ত্রের পারস্পরিক সহযোগিতামূলক কাজের মাধ্যমে দেহের সকল কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ার প্রক্রিয়াকে **সমন্বয়** (Co-ordination) বলে। এ অধ্যায়ে মানবদেহের সমন্বয় ব্যবস্থা এবং এদের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

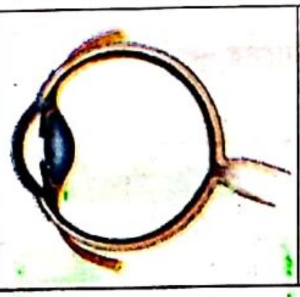
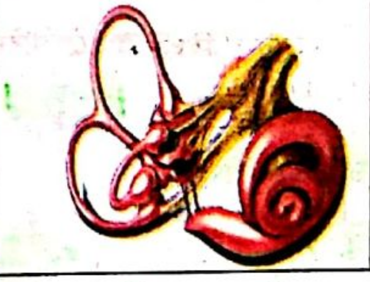
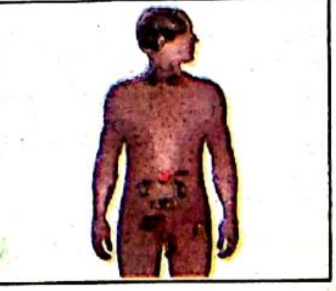

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে শিক্ষার্থীরা যা যা শিখবে –

শিখনফল	বিষয়বস্তু (পিরিয়ড সংখ্যা ১২)
১. স্নায়বিক সমন্বয়ের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. মস্তিষ্কের প্রধান অংশের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. মানুষের বিভিন্ন জৈবিক কার্যক্রমে করোটিক স্নায়ুর ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৪. মানব সংবেদী অঙ্গসমূহের গঠনের সাথে কাজের সম্পর্ক তুলনা করতে পারবে। ৫. রাসায়নিক সমন্বয় ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৬. মানবদেহের বিভিন্ন অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিসমূহের অবস্থান, নিঃসরণ ও ক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৭. দেহের বৃদ্ধি ও আচরণ পরিবর্তনে হরমোনের প্রভাব ও এর অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের ফলাফল বিশ্লেষণ করতে পারবে।	● স্নায়ুবিক সমন্বয় ○ ধারণা ○ মস্তিষ্ক (গঠন, ভাগ, কাজ) ○ করটি স্নায়ু (উৎপত্তি, প্রকৃতি ও কাজ) ● মানব সংবেদী অঙ্গ ○ চোখ ও কান (গঠন ও কাজ) ● রাসায়নিক সমন্বয় ● অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির অবস্থান, নিঃসরণ ও ক্রিয়া ○ পিটুইটারি, ○ থাইরয়েড, ○ এড্রেনাল, ○ গোনাড ○ অগ্ন্যাশয় (আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স) ● হরমোনের প্রভাব ও অনিয়ন্ত্রিত হরমোনের ব্যবহারের ফলাফল

CamScanner

৮.১ স্নায়বিক সমন্বয়ের ধারণা (Concept of Neural Coordination)

প্রাণী যে প্রক্রিয়ায় বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উদ্দীপনায় সাড়া দিয়ে দেহের অভ্যন্তরের বিভিন্ন অঙ্গতন্ত্রের পারস্পরিক সহযোগিতামূলক কাজের মাধ্যমে দেহের সকল কর্মকাণ্ডকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে তাকে **সমন্বয়** (coordination) বলে। প্রাণীর সমগ্র সমন্বয় ব্যবস্থাকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়, যথা– **স্নায়বিক সমন্বয়** ও **রাসায়নিক সমন্বয়**। স্নায়বিক সমন্বয় স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে ও রাসায়নিক সমন্বয় অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতন্ত্রের (হরমোন) মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। স্নায়ুতন্ত্র প্রাণিদেহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন। এটি প্রাণিদেহের বহির্জগতের সঙ্গে অন্তর্জগতের সাম্যাবস্থা বজায় রাখে অর্থাৎ স্নায়ুতন্ত্র মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ, তন্ত্র, কলা ও কোষের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে স্নায়বিক সমন্বয় সম্পন্ন করে।

স্নায়ুতন্ত্র (Nervous System)

নিউরন সমন্বিত যে তন্ত্রের অঙ্গসমূহ দেহের বিভিন্ন অঙ্গের সংযোগ সাধন ও তাদের কাজের সমন্বয় সাধন করে এবং বিভিন্ন উদ্দীপনায় সাড়া দিয়ে বিভিন্ন পরিবেশের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে তাকে **স্নায়ুতন্ত্র** বলে।

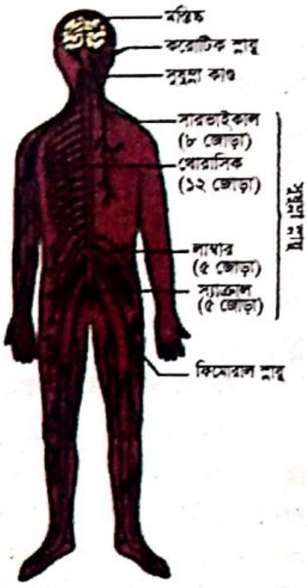

চিত্র ৮.১ : মানুষের স্নায়ুতন্ত্র

স্নায়ুতন্ত্রের কাজ

১। প্রাণিদেহের বিভিন্ন অঙ্গ ও তন্ত্রের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং তাদের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।

২। দেহের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উদ্দীপনা গ্রহণ করা।

৩। উদ্দীপকে সাড়া দিয়ে নিজ নিজ পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করা।

৪। দেহস্থ বিভিন্ন পেশি সংকোচন ও বিভিন্ন গ্রন্থির ক্ষরণে সহায়তা করা।

৫। মানসিক প্রবৃত্তি, মায়া-মমতা, ভালোবাসা, জ্ঞান, বুদ্ধি, চিন্তা-চেতনা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে।

স্নায়ুতন্ত্রের শ্রেণিবিভাগ : সমগ্র স্নায়ুতন্ত্রকে ২টি প্রধান তন্ত্রে ভাগ করা যায়, যথা– **কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র** ও **প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র**।

স্নায়ুতন্ত্রের শ্রেণিবিন্যাসের ছক

১। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (Central nervous system-CNS) **:** মানুষসহ অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীর পৌষ্টিকনালির পৃষ্ঠদেশে লম্বালম্বিভাবে অবস্থিত অর্থাৎ কেন্দ্রীয় অক্ষ বরাবর মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড নিয়ে গঠিত, স্নায়ুতন্ত্রের যে অংশ স্নায়বিক কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করে, তাকে **কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র** বলে। স্নায়ুতন্ত্রের এই অংশ দেহের ভাবুক বা তথ্য প্রসেসর হিসেবে কাজ করে। এর দুটি প্রধান অংশ, যথা– i. **মস্তিষ্ক** (brain) ও ii. **সুষুম্নাকাণ্ড** (spinal cord)। দেহের পৃষ্ঠীয় মধ্যরেখা বরাবর অবস্থিত ফাঁপা নলাকৃতি স্নায়ুতন্ত্রের অগ্রভাগে অবস্থিত স্ফীত অংশকে বলা হয় **মস্তিষ্ক** এবং পশ্চাতের সরু দণ্ডাকৃতি অংশের নাম **সুষুম্নাকাণ্ড**। **ফোরামেন ম্যাগনাম** (foramen magnum) নামক বিবরে মস্তিষ্ক সুষুম্নাকাণ্ডের সঙ্গে মিলিত হয়। সুষুম্নাকাণ্ডের ফাঁপা গহ্বরে অর্থাৎ নিউরোসিলে একপ্রকার লসিকা জাতীয় তরল থাকে। এই তরলকে বলা হয় **মস্তিষ্ক-সুষুম্না রস** (Cerebrospinal fluid-CSF)। সমগ্র মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড তিনটি তন্তুময় আবরক দ্বারা গঠিত **মেনিনজেস** (meninges) নামক ঝিল্লি দ্বারা আবৃত থাকে। এই আবরক তিনটি হলো- (i) **বহিঃস্থ দৃঢ় আবরক বা ডুরা ম্যাটার** (dura mater), (ii) **মধ্যস্থ আবরক ঝিল্লি বা অ্যারাকনয়েড ম্যাটার** (arachnoid mater) ও (iii) **অন্তঃআবরক ঝিল্লি বা পায়া ম্যাটার** (pia mater)। মেনিনজেস জীবাণু দ্বারা সংক্রামিত হলে **মেনিনজাইটিস** (meningitis) রোগ হয়। **মস্তিষ্কের বাইরের দিকে ধূসর পদার্থ** (gray matter) **এবং ভেতরের দিকে শ্বেত পদার্থ** (white matter) থাকে। **কিন্তু সুষুম্নাকাণ্ডের ভেতরের দিকে ধূসর পদার্থ এবং বাইরের দিকে শ্বেত পদার্থ থাকে।**

CamScanner

২। প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র (Peripheral nervous system-PNS): মানবদেহে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের বাইরের করোটিক স্নায়ু ও সুষুম্নাস্নায়ুগুলো একত্রে যে স্নায়ুতন্ত্র গঠন করে তাকে **প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র** বলে। এই অংশ অভিনেতা বা কুশীলব হিসেবে পরিচিত। মস্তিষ্ক থেকে উৎপন্ন ১২ জোড়া করোটিক স্নায়ু ও সুষুম্নাকাণ্ড থেকে উৎপন্ন ৩১ জোড়া সুষুম্নাস্নায়ু এবং স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র নিয়ে **প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র** গঠিত। এসব স্নায়ু দেহের বিভিন্ন আন্তরযন্ত্র (visceral organ) বা বিভিন্ন অংশে বিস্তার লাভ করে এবং এ অঙ্গসমূহ বা অংশসমূহ থেকে **সংজ্ঞাবহ উদ্দীপনা** (sensory impulse)-কে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে পরিবাহিত করে। এছাড়াও কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে কার্যকরী নির্দেশ ঐ সমস্ত অঙ্গ বা অংশে পরিবাহিত করে। তার ফলে ঐ সমস্ত অঙ্গে বা অংশে প্রতিক্রিয়া ঘটে ও বিভিন্ন কার্য সম্পাদিত হয়। প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র ২ ভাগে বিভক্ত। যথা- ক. ঐচ্ছিক স্নায়ুতন্ত্র ও খ. স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র।

(ক) ঐচ্ছিক স্নায়ুতন্ত্র (Voluntary nervous system): এ ধরনের স্নায়ুতন্ত্র ১২ জোড়া করোটিক স্নায়ু (cranial nerves) ও ৩১ জোড়া সুষুম্ন স্নায়ু (spinel nerves) নিয়ে গঠিত।

(খ) স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র বা আন্তরযন্ত্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (Autonomic nervous systemor Visceral nervous system): কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে সৃষ্ট স্নায়ুসমূহের দ্বারা গঠিত স্নায়ুতন্ত্রের যে অংশ দেহের আন্তরযন্ত্রের (visceral organs) বিভিন্ন কাজ (যেমন– হৃৎস্পন্দনের হার, লালা ক্ষরণ, পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রান্ত্রের বিচলন ইত্যাদি) নিয়ন্ত্রণ করে তাকে **স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র** বা **আন্তরযন্ত্রীয় স্নায়ুতন্ত্র** বলে। স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণাধীন নয় এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে (অনৈচ্ছিক) এরা কার্য সম্পাদনে সক্ষম। দেহের ভেতরের অঙ্গসমূহ যেমন– হৃৎপিণ্ড, রক্তনালি, ফুসফুস, অন্ত্র, পাকস্থলী, অগ্ন্যাশয়, গ্রন্থি এবং সমগ্র দেহের অনৈচ্ছিক পেশির সক্রিয়তা নিয়ন্ত্রণসহ ইত্যাদির কাজ স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত। স্বয়ংক্রিয় স্নায়ু দু'রকম। যথা– **সিমপ্যাথেটিক** (sympathetic)এবং **প্যারাসিমপ্যাথেটিক** (parasympathetic)।এদের উৎপত্তি কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে। সুষুম্নাকাণ্ডের বক্ষ ও কটিদেশের খণ্ড থেকে সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুর উৎপত্তি হয়। প্যারাসিমপ্যাথেটিক স্নায়ু কয়েকটি করোটিক স্নায়ুর (III, VII, IX এবং X) স্নায়ুকেন্দ্র থেকে এবং সুষুম্নাকাণ্ডের স্যাক্রাল খণ্ড থেকে সৃষ্টি হয়। সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুগুলো সাধারণত বিভিন্ন জৈব প্রক্রিয়ার উদ্দীপনা জোগায় এবং প্যারাসিমপ্যাথেটিকস্নায়ুগুলো সাধারণত বিভিন্ন জৈব প্রক্রিয়ার উদ্দীপনা দমিত করে বা ওদের দমনমূলক কাজে সাহায্য করে।

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র ও পেরিফেরাল বা প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্রের পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র	প্রান্তীয় বা পেরিফেরাল স্নায়ুতন্ত্র
১। সংজ্ঞা	মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড নিয়ে যে স্নায়ুতন্ত্র গঠিত তাকে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র বলে।	করোটিক স্নায়ু, সুষুম্না স্নায়ু ও স্বয়ংক্রিয় স্নায়ু নিয়ে যে স্নায়ুতন্ত্র তাকে পেরিফেরাল স্নায়ুতন্ত্র বলে।
২। উৎপত্তি	সুষুম্নাকাণ্ড থেকে উৎপন্ন হয়।	মস্তিষ্ক থেকে উৎপন্ন হয়।
৩। সংখ্যা	করোটিকার মধ্যে অবস্থিত মস্তিষ্ক ও স্নায়ুরজ্জু দুটি প্রধান অংশ।	স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র ১২ জোড়া করোটিক স্নায়ু ও ৩১ জোড়া সুষুম্না স্নায়ু নিয়ে গঠিত।
৪। প্রতিরক্ষামূলক আবরণ	মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড উভয়েরই তিনটি করে প্রতিরক্ষাকারী আবরণ আছে।	তেমন কোনো প্রতিরক্ষাকারী আবরণ নেই।
৫। গহ্বর	মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডের ভেতরে বেশ কিছু গহ্বর আছে।	তেমন কোনো গহ্বর নেই।
৬। বিস্তৃতি	মস্তিষ্ক ও স্নায়ুরজ্জুতেই এর বিস্তার।	মস্তিষ্ক থেকে বিভিন্ন জ্ঞানেন্দ্রীয়ে বিস্তার।

স্নায়ুকলা (Nervous tissue)

ভ্রূণীয় এক্টোডার্ম থেকে উৎপন্ন যে কলা কোনো উদ্দীপনা গ্রহণ করে তার উপযুক্ত প্রতিবেদন সৃষ্টি করতে সক্ষম তাকে **স্নায়ুকলা** বলে। অসংখ্য **স্নায়ুকোষ** বা **নিউরন** ও কিছু সংখ্যক **নিউরোগ্লিয়া** বা **ধারক** কোষের সমন্বয়ে স্নায়ুকলা গঠিত। তবে স্নায়ুকলার প্রধান উপাদান হলো নিউরন।

নিউরন (Neurone)

কোষদেহ ও সব ধরনের প্রবর্ধক নিয়ে গঠিত স্নায়ুতন্ত্রের গঠনগত ও কার্যগত একককে **নিউরন** বলে।

গঠন (Structure) : নিউরন দুটি প্রধান অংশ নিয়ে গঠিত। যথা–

১। কোষদেহ বা সোমা বা সেল বডি (Cell body) : এটি একক পর্দাবেষ্টিত প্রোটোপ্লাজমযুক্ত গোলাকার, ডিম্বাকার বা নক্ষত্রাকার অংশবিশেষ। এর মধ্যে নিউক্লিয়াস, সাইটোপ্লাজম (নিউরোপ্লাজম), নিসল দানা (nissl's granule), নিউরোফাইব্রিল, বারবস্তু (barr bodies) ও বিভিন্ন ধরনের কোষঅঙ্গাণু থাকে। উল্লেখ্য, নিউরনের সেন্ট্রোজোমটি নিষ্ক্রিয় হওয়ায় নিউরন বিভাজিত হয় না। নিউরনের কোষদেহকে নিউরোসাইটন (neurocyton) বলে। নিসল দানা প্রোটিন সংশ্লেষণে অংশগ্রহণ করে।

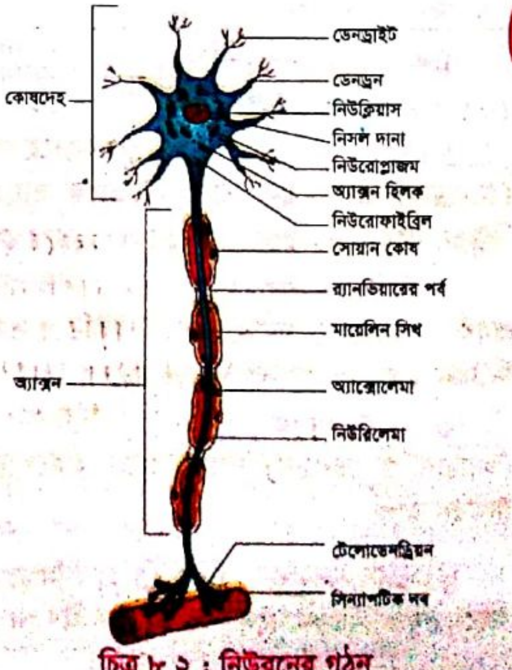

চিত্র ৮.২ : নিউরনের গঠন

CS CamScanner

২। প্রবর্ধক বা প্রসেস (Process) : নিউরনে দু'রকমের প্রবর্ধক থাকে। যথা– (ক) **অ্যাক্সন** ও (খ) **ডেনড্রন**। এদের একত্রে **নিউরাইটস** (neurites) বলে।

(ক) অ্যাক্সন (Axon) : এটি নিউরনের দীর্ঘ চেষ্টীয় প্রবর্ধক। এটি সাধারণত শাখাহীন বা স্বল্প শাখাযুক্ত হয়। অ্যাক্সনের শাখাকে **অক্ষশাখা** (collateral) বলে। অ্যাক্সনের কোষদেহ সংলগ্ন অংশটি নিউরিলেমা আবরণবিহীন হয়। এই অংশকে **অ্যাক্সন হিলক** (axon hillock) বলে। অ্যাক্সনের সাইটোপ্লাজমকে **অ্যাক্সোপ্লাজম** (axoplasm) বলে। অ্যাক্সনে নিসল দানা থাকে না। অ্যাক্সনটি **নিউরিলেমা** (neurilemma) নামক আবরণে আবৃত থাকে। এছাড়াও নিউরনে **অ্যাক্সোলেমা** (axolemma) ও **মায়েলিন সিথ** (myelin sheath) বা **মেডুলারি আবরণ** (medullary sheath) থাকে। নিউরিলেমার নিচে **সোয়ান কোষ** (schwann cell) থাকে। নিউরিলেমা মাঝে মাঝে সংকুচিত হয়ে **র‍্যানভিয়ারের পর্ব** (nodes of ranvier) গঠন করেছে, যেখানে মেডুলারি আবরণ থাকে না।

অ্যাক্সনের শেষপ্রান্ত অসংখ্য সূক্ষ্ম শাখান্বিত হয়ে **প্রান্তবুরুশ** বা **এন্ড ব্রাশ** (end brush) বা **টেলোডেনড্রিয়া** (telodendri, একবচনে telodendrion) গঠন করে। টেলোডেনড্রিয়ার শেষ প্রান্তের স্ফীত অংশের নাম **সিন্যাপটিক নব** (synaptic knob)। অ্যাক্সন লম্বায় ১ মিটারের বেশি হতে পারে। সমস্ত দীর্ঘ স্নায়ুতন্তুগুচ্ছকে (bundle) **স্নায়ু** (nerve) বলে।

(খ) ডেনড্রন (Dendron) : ডেনড্রন কোষদেহ থেকে উৎপন্ন ক্ষুদ্র শাখা-প্রশাখাযুক্ত সংজ্ঞাবহ বা সংবেদী প্রবর্ধক। ডেনড্রনের এক-একটি শাখাকে **ডেনড্রাইট** (dendrite) বলে। ডেনড্রনে নিউরোপ্লাজম, নিউরোফাইব্রিল ও নিসল দানা থাকে। ডেনড্রন উহার শাখা দ্বারা (ডেনড্রাইট) অন্য একটি নিউরনের সাথে যুক্ত থাকে। ডেনড্রাইটের মাধ্যমে স্নায়ু উদ্দীপনা কোষদেহ বা সোমার দিকে প্রেরিত হয়। স্নায়ুতন্ত্রে নিউরনের সোমা ঘনিষ্ঠভাবে একত্রিত হয়ে **গ্রে ম্যাটার** (grey matter) এবং অ্যাক্সন ও ডেনড্রাইট একত্রিত হয়ে **হোয়াইট ম্যাটার** (white matter) গঠন করে।

নিউরনের কাজ : নিউরনের প্রধান কাজ হলো স্নায়ুস্পন্দন পরিবহন করা। সংজ্ঞাবহ নিউরন স্নায়ু-আবেগকে রিসেপ্টর থেকে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে এবং চেষ্টীয় নিউরন প্রতিক্রিয়াকে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে ইফেক্টর অঙ্গে বহন করে।

অ্যাক্সন ও ডেনড্রাইটের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	অ্যাক্সন	ডেনড্রাইট
১। প্রতিটি স্নায়ুকোষে সংখ্যা	একটি মাত্র	এক বা একাধিক কখনও অনুপস্থিত
২। প্রকৃতি	চেষ্টীয় প্রবর্ধক	সংবেদী প্রবর্ধক
৩। দৈর্ঘ্য	লম্বা	খাটো
৪। শাখা-প্রশাখা	নেই	আছে
৫। মেডুলারি আবরণ	আছে	নেই
৬। র‍্যানভিয়ারের পর্ব	থাকে	থাকে না
৭। উদ্দীপনা পরিবহন	কোষদেহ থেকে দূরে	দূর থেকে কোষদেহে

নিউরনের প্রকারভেদ (Types of neurone)

(ক) গঠন অনুসারে নিউরন পাঁচ প্রকার, যথা–

১। অ্যাপোলার (Apolar) : কোষদেহে যখন কোনো প্রবর্ধক (ডেনড্রাইট ও অ্যাক্সন) থাকে না তাকে অ্যাপোলার বা মেরুহীন নিউরন বলে। এ ধরনের নিউরন অ্যাড্রিনাল মেডুলায় থাকে।

২। ইউনিপোলার (Unipolar) : নিউরনে যখন একটি মাত্র প্রবর্ধক (অ্যাক্সন) থাকে, তাকে ইউনিপোলার বা একমেরুযুক্ত নিউরন বলে। এ ধরনের নিউরন ভ্রূণের দেহে থাকে।

৩। বাইপোলার (Bipolar) : নিউরনে যখন দুটি প্রবর্ধক (অ্যাক্সন ও ডেনড্রন) থাকে তাকে বাইপোলার বা দ্বিমেরুযুক্ত নিউরন বলে।

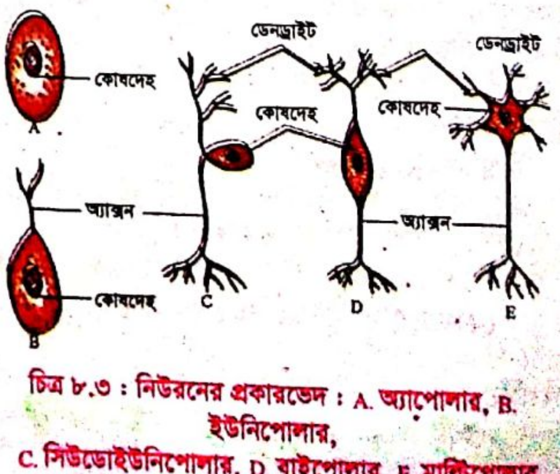

চিত্র ৮.৩ : নিউরনের প্রকারভেদ : A. অ্যাপোলার, B. ইউনিপোলার, C. সিউডোইউনিপোলার, D. বাইপোলার, E. মাল্টিপোলার

৪। মাল্টিপোলার (Multipolar) : নিউরনে যখন তিন বা ততোধিক প্রবর্ধক থাকে তখন তাকে মাল্টিপোলার বা বহুমেরুযুক্ত নিউরন বলে। এ ধরনের নিউরন কেন্দ্রীয় ও প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্রে থাকে।

CS CamScanner

৫। **সিউডোইউনিপোলার** (Pseudounipolar) : কোষদেহ থেকে একটি প্রবর্ধক নির্গত হয়ে দ্বিধাবিভক্ত হয়। এ ধরনের নিউরন সুষুম্নাকাণ্ডের বাইরের অংশে থাকে।

(খ) কাজের ভিত্তিতে নিউরন তিন প্রকার, যথা–

১। **সংজ্ঞাবহ নিউরন** (Sensory neurone) : এই প্রকার নিউরন স্নায়ুস্পন্দনকে রিসেপ্টর থেকে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে প্রেরণ করে।

২। **আজ্ঞাবহ বা চেষ্টীয় নিউরন** (Motor neurone) : এই প্রকার নিউরন কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন অঙ্গে প্রেরণ করে।

৩। **আন্তঃসংযোগী বা সহযোগী নিউরন** (Inter or Adjustor neurone) : এই প্রকার নিউরন সংজ্ঞাবহ ও চেষ্টীয় নিউরনের মধ্যে সংযোগ সাধন করে।

সংজ্ঞাবহ স্নায়ু ও চেষ্টীয় স্নায়ুর পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	সংজ্ঞাবহ স্নায়ু	চেষ্টীয় স্নায়ু
১। গঠন	অন্তর্মুখী স্নায়কোষে গঠিত।	বহির্মুখী স্নায়ুকোষে গঠিত।
২। স্নায়ু আবেগ সংগ্রহ	দেহের বিভিন্ন জ্ঞানেন্দ্রীয় ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে সংগ্রহ করে।	দেহের বিভিন্ন জ্ঞানেন্দ্রীয় ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কাজ করার নির্দেশ পৌছে দেয়।
৩। স্নায়ু আবেগ পরিবহন	গ্রাহক কোষ থেকে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে পরিবহন করে।	কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পরিবহন করে।
৪। শাখা-প্রশাখার সমাপ্তি	সাধারণত জ্ঞানেন্দ্রীয়।	সাধারণত পেশিতে।
৫। সংখ্যা	সংজ্ঞাবহ স্নায়ু অপেক্ষাকৃত সংখ্যায় কম।	চেষ্টীয় স্নায়ুর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশি।

স্নায়ুতন্তু (Nerve fibre)

নিউরনের চেষ্টীয় প্রবর্ধক অর্থাৎ অ্যাক্সনকে **স্নায়ুতন্তু** বলে। গঠন অনুসারে স্নায়ুতন্ত্র প্রধানত দুই প্রকার, যথা– ১। **মায়েলিন সিথযুক্ত** বা **মেডুলারি আবরণযুক্ত স্নায়ুতন্তু** ও ২। **মায়েলিন সিথবিহীন** বা **মেডুলারি আবরণবিহীন স্নায়ুতন্ত্র**।

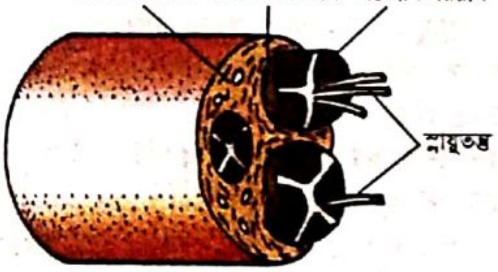

চিত্র ৮.৪ : প্রস্থচ্ছেদে স্নায়ুর অংশ

স্নায়ু (Nerve)

এপিনিউরিয়াম নামক যোজক কলার আবরণী বেষ্টিত, রক্তবাহ ও ফ্যাট কোষযুক্ত স্নায়ুতন্তুগুচ্ছকে স্নায়ু বলে।

গঠন (Structure) : স্নায়ুতে যোজক কলার তিনটি আবরণ থাকে। যথা– বাইরেরটি **এপিনিউরিয়াম** (epineurium), মাঝেরটি **পেরিনিউরিয়াম** (perineurium) এবং ভেতরেরটিকে **এন্ডোনিউরিয়াম** (endoneurium) বলে।

প্রকারভেদ (Types)

(ক) গঠন অনুসারে স্নায়ু দুই প্রকার, যথা–

১। **মেডুলেটেড স্নায়ু** (Medulated nerve) : এ ধরনের স্নায়ুর স্নায়ুতন্তুতে মেডুলারি আবরণ থাকে।

২। **নন মেডুলেটেড স্নায়ু** (Non-medulated nerve) : এ ধরনের স্নায়ুতন্তুতে মেডুলারি আবরণ থাকে না।

(খ) কাজ অনুসারে স্নায়ু দুই প্রকার, যথা–

১। **অন্তর্বাহী স্নায়ু** (Afferent nerve) : যে স্নায়ু উদ্দীপনা রিসেপ্টর থেকে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে বহন করে তাকে অন্তর্বাহী স্নায়ু বলে। এ প্রকার স্নায়ু সংজ্ঞাবহ বা সংবেদী নিউরন দিয়ে গঠিত। যেমন– অপটিক স্নায়ু।

২। **বহির্বাহী স্নায়ু** (Efferent nerve) : যে স্নায়ু উদ্দীপনা বা সাড়া কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে প্রান্তীয় অঞ্চলে বহন করে তাকে বহির্বাহী স্নায়ু বলে। এ ধরনের স্নায়ু চেষ্টীয় নিউরন দিয়ে গঠিত। যেমন– হাইপোগ্লোসাল স্নায়ু।

এছাড়াও কিছু স্নায়ু আছে যারা উদ্দীপনা উভয়দিকে পরিবহন করে এবং সংজ্ঞাবহ ও চেষ্টীয় উভয় নিউরন দিয়ে গঠিত। এদের **মিশ্র স্নায়ু** (mixed nerve) বলে। যেমন– ভেগাস স্নায়ু।

নিউরোগ্লিয়া (Neuroglea)

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের যোজক কলাকে **নিউরোগ্লিয়া** বলে। নিউরনের সুরক্ষাই ইহার প্রধান কাজ। নিউরনের মৃত্যুর পর নিউরোগ্লিয়া তার স্থান দখল করে। এটি এক ধরনের পরিবর্তিত যোজক কলা। স্নায়ুতন্ত্রের কোষ সমষ্টির 90% নিউরোগ্লিয়া। এরা স্নায়ুস্পন্দন পরিবহন করতে পারে না। এরা বিভিন্ন প্রকারের হয়, যেমন– (১) তারকাকার **অ্যাস্ট্রোসাইট** (astrocyte): এরা নিউরনে পুষ্টি সরবরাহ করে; (২) স্বল্প প্রবর্ধকযুক্ত **অলিগোডেন্ড্রোগ্লিয়া** বা **অলিগোডেন্ড্রোসাইট** (oligodendroglea or oligodendrocyte): এরা স্নায়ুরজ্জুর মায়েলিন আবরণী গঠন করে এবং (৩) ক্ষুদ্রাকার **মাইক্রোগ্লিয়া** (microglea): এরা গতিশীল এবং ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় জীবাণু ভক্ষণ করে।

CamScanner

নিউরোগ্লিয়ার কাজ : এরা ধারক কোষ হিসেবে কাজ করে। অগ্রাসী কোষ হিসেবে কাজ করে। স্নায়ুকোষে আয়ন পরিবহনে সহায়তা করে। মায়েলিন সিথ গঠনে অংশ নেয়।

নিউরোট্রান্সমিটার (Neurotransmitters)

স্নায়ুকোষ থেকে নিঃসৃত হয়ে যেসব রাসায়নিক বস্তু স্নায়ু উদ্দীপনার তথ্যকে এক নিউরন হতে অন্য নিউরন কিংবা পেশি কোষ কিংবা কোনো গ্রন্থিতে পরিবহনে সহায়তা করে তাদের **নিউরোট্রান্সমিটার** বলে। নিউরন থেকে ক্ষরিত কোনো রাসায়নিক দ্রব্য যখন রক্তে প্রবেশ করে এবং হরমোনের ন্যায় কাজ করে তখন তাকে **নিউরোহরমোন** (neurohormone) বলে।

স্নায়ু প্রান্ত থেকে নিঃসৃত রাসায়নিক বস্তু যখন বহিঃকোষীয় তরল বা কোনো নির্দিষ্ট অঙ্গে মুক্ত হয় তখন তাকে **নিউরোসিক্রেশন** (neurosecretion) বলে। নিউরোট্রান্সমিটার হিসেবে যেসব রাসায়নিক পদার্থই গণ্য হয়, সেগুলো– (১) সংশ্লিষ্ট নিউরনে সংশ্লেষিত হয়; (২) প্রিসিন্যাপটিক প্রান্তে সঞ্চিত থাকতে পারে; (৩) কেবলমাত্র সিন্যাপসে মুক্ত হয়; (৪) পোস্টসিন্যাপটিক মেমব্রেনে সুনির্দিষ্ট রিসেপ্টর দ্বারা গৃহীত হয় ও (৫) ক্রিয়া শেষে খুব দ্রুত উপযোগী মাধ্যম দ্বারা পরিত্যক্ত হয়।

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নিউরোট্রান্সমিটারের নাম ও প্রকৃতি : (১) **জৈব অ্যামিনো :** সেরোটোনিন, নরইপিনেফ্রাইন, হিস্টামিন, ডোপামিন, ইপিনেফ্রাইন; (২) **পেপটাইড :** নিউরোটেনসিন, সোমাটোস্টেটিন, ডাইনোরফিন, সাব্সটেন্স-P, এন্ডোরফিন; (৩) **অ্যামিনো এসিড :** অ্যাসপারটিক এসিড, গ্লুটামিক এসিড, গ্লাইসিন, GABA এবং (৪) **অন্যান্য :** অ্যাসেটিলকোলিন, ATP, অ্যাডিনোসিন, CO, প্রোস্টাগ্লান্ডিন, নাইট্রিক অক্সাইড (NO)।

সিন্যাপস (Synapse)

স্নায়ুতন্ত্র অসংখ্য নিউরন নিয়ে গঠিত হলেও নিউরনগুলোর মধ্যে কোনো প্রত্যক্ষ প্রোটোপ্লাজমীয় সংযোগ থাকে না। সাধারণ একটি নিউরনের **অ্যাক্সন** প্রান্ত অন্য নিউরনের **ডেনড্রাইট** প্রান্তের খুব কাছে অবস্থান করে কিন্তু অ্যাক্সন ডেনড্রাইটকে স্পর্শ করে না। এভাবে, **দুটি স্নায়ুর মধ্যে সূক্ষ্ম ফাঁকযুক্ত সংযোগস্থল যেখানে একটি নিউরনের অ্যাক্সনের প্রান্ত শেষ হয় এবং অন্য একটি নিউরন (যেকোনো অংশ অর্থাৎ অ্যাক্সন ডেনড্রাইট বা সোমা) শুরু হয়, তাকে সিন্যাপস** (synapse) **বলে**। ব্রিটিশ নিউরোলজিস্ট Chrles Sherrington (1897) সর্বপ্রথম সিন্যাপস শব্দটি ব্যবহার করেন।

সিন্যাপস-এর গঠন : দুটি নিউরনের অংশ মিলিত হয়ে সিন্যাপস গঠন করে। যে নিউরনের অ্যাক্সন সিন্যাপস গঠনে অংশ নেয় তাকে **প্রিসিন্যাপটিক নিউরন** বলে। সিন্যাপস গঠনকারী অন্য নিউরনকে **পোস্টসিন্যাপটিক নিউরন** বলা হয়। প্রিসিন্যাপটিক নিউরনের প্রিসিন্যাপটিক ঝিল্লি এবং পোস্টসিন্যাপটিক নিউরনের পোস্টসিন্যাপটিক ঝিল্লি সম্মিলিতভাবে সিন্যাপস গঠন করে। এ দুটি ঝিল্লির মাঝে প্রায় 20nm-30nm (ন্যানোমিটার) ফাঁক থাকে। এই ফাঁককে **সিন্যাপটিক ক্লেফট** (synaptic cleft) বলে। প্রিসিন্যাপটিক ঝিল্লি প্রকৃতপক্ষে প্রিসিন্যাপটিক নিউরনের অ্যাক্সনের স্ফীত প্রান্তের অংশ। অ্যাক্সনের স্ফীত প্রান্তকে **সিন্যাপটিক নব** (synaptic knob) বলে। এই নবের ভেতরে অসংখ্য মাইটোকন্ড্রিয়া, মাইক্রোফিলামেন্ট এবং নিউরোট্রান্সমিটারযুক্ত ভেসিকল থাকে। পোস্টসিন্যাপটিক ঝিল্লি, পোস্টসিন্যাপটিক নিউরন সোমা বা ডেনড্রাইট বা অ্যাক্সনের অংশ।

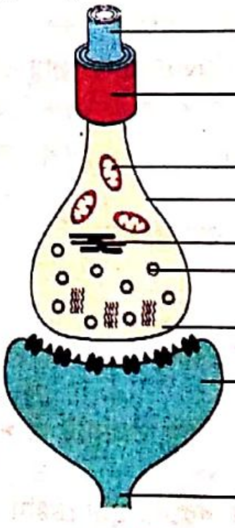

চিত্র ৮.৫ক : সিন্যাপসের গঠন

সিন্যাপসের প্রকারভেদ : সিন্যাপস চার রকম, যথা–

১। **অ্যাক্সোসোমাটিক সিন্যাপস** (Axosomatic synapse) : এ জাতীয় সিন্যাপসে একটি নিউরনের অ্যাক্সনের শাখা প্রান্তগুলো অন্য নিউরনের সোমাক কোষদেহের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থাকে।

২। **অ্যাক্সোডেনড্রাইটিক সিন্যাপস** (Axodendritic synapse) : এ জাতীয় সিন্যাপসে একটি নিউরনের অ্যাক্সনের শাখা প্রান্তগুলো অন্য নিউরনের ডেনড্রাইটের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থাকে।

৩। **অ্যাক্সোঅ্যাক্সোনিক সিন্যাপস** (Axoaxonic synapse) : এ জাতীয় সিন্যাপসে একটি নিউরনের অ্যাক্সনের শাখা প্রান্তগুলো অন্য নিউরনের অ্যাক্সনের শাখা প্রান্তের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থাকে।

CamScanner

৪। ডেনড্রোডেনড্রাইটিক সিন্যাপস (Dendrodendritic synapse) : এ ধরনের সিন্যাপসে একটি নিউরনের ডেনড্রাইট অংশ অ...্য নিউরনের ডেনড্রাইটের সঙ্গে যুক্ত থাকে।

সিন্যাপসের কাজ :

১। নিউরনের প্রধান কাজ নিউরন থেকে নিউরনে তথ্য স্থানান্তর করা।

২। স্নায়ু-উদ্দীপনাকে শুধুমাত্র একদিকে প্রেরণ করে নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌছাতে সহায়তা করে।

৩। বিভিন্ন নিউরনের প্রতি সমন্বিত সাড়া দেয়।

৪। অতি নিচু মাত্রার উদ্দীপনাকে বাছাই করে বাদ দিয়ে দেয়।

৫। প্রচণ্ড স্নায়ু-উদ্দীপনায় নিউরোট্রান্সমিটার পদার্থের ক্ষরণ কমিয়ে অতি-উদ্দীপনা প্রবাহে বাধা দেয়, ফলে কার্যকর (effector) অংশ ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পায়।

স্নায়ু উদ্দীপনা পরিবহন (Nerve impulse transmission)

অ্যাক্সনের মাধ্যমে স্নায়ু উদ্দীপনা পরিবহন (Axonal transmission)

সাধারণত স্বাভাবিক অবস্থায় অ্যাক্সনের বহিঃকোষীয় তরলে Na^+ও Cl^- অধিক ঘনত্বে এবং অ্যাক্সনের ভেতরের তরল বা অ্যাক্সোপ্লাজমে K^+ অধিক ঘনত্বে বিরাজ করে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, অ্যাক্সনের বহিঃকোষীয় তরলে অ্যাক্সোপ্লাজম অপেক্ষা 10 গুণ Na^+ ও Cl^- আয়ন বেশি এবং অ্যাক্সোপ্লাজমে বহিঃকোষীয় তরল অপেক্ষা 25 গুণ বেশি K^+ আয়ন বিদ্যমান থাকে। এমতাবস্থায় অ্যাক্সনের বাইরে ও ভেতরে বিদ্যমান আয়নের পার্থক্যের কারণে অ্যাক্সন মেমব্রেনেযে বৈদ্যুতিক বিভব বজায় থাকে তাকে স্থির বিভব বা resting potential বলে। স্থির বিভব অবস্থায় অ্যাক্সন মেমব্রেনের কিছু K^+ আয়ন মেমব্রেন ভেদ করে বাইরে আসতে পারে কিন্তু আয়ন ভেতরে প্রবেশ করতে পারে না। এর ফলে বাহিরের তুলনায় ভেতরের ঋণাত্মক চার্জের পরিমাণ বেশি থাকে।

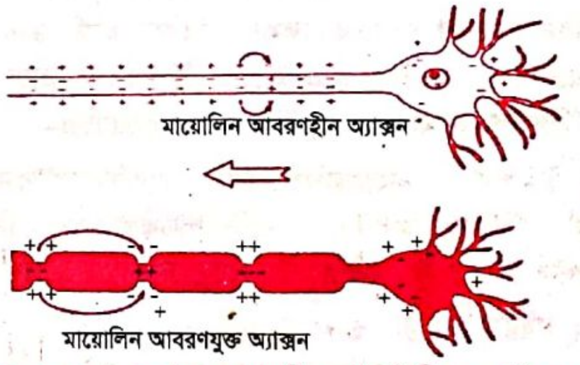

চিত্র : ৮.৫ খ : অ্যাক্সনের মধ্যদিয়ে স্নায়ু উদ্দীপনা পরিবহন

মেমব্রেনের কোনো স্থান অ্যাক্সন উদ্দীপিত হলে সে স্থানের ভেদ্যতার ক্ষণস্থায়ী পরিবর্তন ঘটে। এ পরিবর্তনের ফলে মেমব্রেনের বাইরের Na^+ আয়ন অ্যাক্সনের ভেতরে প্রবেশ করে ডিপোলারাইজেশন (depolarization) ঘটায় অর্থাৎ মেমব্রেনের বহির্ভাগদিক ঋণাত্মক ও ভেতরের দিক ধনাত্মক চার্জযুক্ত হয়ে পড়ে। এ সময় অ্যাক্সনের মেমব্রেন অংশে যে বৈদ্যুতিক বিভব সৃষ্টি হয় তাকে ক্রিয়াবিভব (action potential) বলে। এ সময় অ্যাক্সন মেমব্রেনের উদ্দীপিত পরিবর্তিত অঞ্চল ও স্বাভাবিক অঞ্চলের মধ্যে তড়িৎবর্তনীর সৃষ্টি হয়। মেমব্রেনের বহির্ভাগের ধনাত্মক তড়িৎ প্রবাহ পরিবর্তিত অঞ্চলের ঋণাত্মক তড়িতের দিকে পরিবাহিত হয় এবং পুনরায় অন্তর্দেশীয় পরিবর্তিত অঞ্চল হতে স্বাভাবিক অঞ্চলেফিরে আসে। এভাবে সৃষ্ট তড়িৎবর্তনী অ্যাক্সন মেমব্রেনের সন্নিহিত অঞ্চলকে ক্রমান্বয়ে উদ্দীপিত করে। এর ফলে স্নায়ু উদ্দীপনা অ্যাক্সনের দৈর্ঘ্য বরাবর উভয়দিকে সঞ্চারিত হয়। খুবশীঘ্রই উদ্দীপিত স্থানে রিপোলারাইজেশন (repolarization) ঘটে আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। প্রথমে স্নায়ু উদ্দীপনা অ্যাক্সনের উভয় দিকে সঞ্চারিত হলেও সাইন্যাপসের কার্যকারিতার মাধ্যমেতা একমুখী হয়ে পড়ে। অ্যাক্সন মায়োলিন আবরণ দ্বারা আবৃত থাকলে উহা বহিঃকোষীয় তরলের সংস্পর্শে আসতে পারে না। কেবল র‍্যানভিয়ারের নোড বরাবর সংযোগ স্থাপিত হয় এবং স্নায়ু উদ্দীপনা এক নোড হতে অন্য নোডে লাফিয়ে লাফিয়ে পরিবাহিত হয়। এতে স্নায়ু উদ্দীপনার স্বাভাবিক গতি দ্রুত হয়।

সিন্যাপসেরমাধ্যমে স্নায়ু উদ্দীপনা পরিবহন(Synaptic transmission)

সিন্যাপসেরমাধ্যমে স্নায়ুতন্ত্রে উদ্দীপনা পরিবাহিত হয়। এটি একটি জটিল প্রক্রিয়া। প্রক্রিয়া নিম্নরূপ–

১। একটি স্নায়ু উদ্দীপ্ত হলে যে স্নায়ু আবেগ(Nerve impulse) উৎপন্ন হয় তা স্নায়ুর ভেতর দিয়ে পরিবাহিত হয়ে সিন্যাপটিক নবে পৌছে নবেরঝিল্লিকে উদ্দীপ্ত করে, ফলে ঝিল্লির ভেদ্যতা বৃদ্ধি পায়।

২।ভেদ্যতা বেড়ে গেলে নবের চারপাশের অর্থাৎ কোষবহিঃস্থ তরল পদার্থ থেকে Ca^{++} নবের মধ্যে প্রবেশ করে।

৩। Ca^{++} নবের ভেতরকার তরলে (কোষমধ্যস্থ তরলে) অবস্থিত মাইটোকন্ড্রিয়ার নিষ্ক্রিয় ATP-ase (অ্যাডোনোসিন ট্রাইফসফোটেজ) এনজাইমকে সক্রিয় করে।

৪। সক্রিয় **ATP-ase** এনজাইম ATP-কে ভেঙে তা থেকে জৈবশক্তি বের করে।

৫। এ জৈবশক্তি সিন্যাপটিক নবে অবস্থিত অ্যাসিটাইলকোলিন নামে রাসায়নিক প্রেরক পদার্থে পূর্ণ থলিগুলোকে বিদীর্ণ করে। ফলে অ্যাসিটাইলকোলিন বেরিয়ে পড়ে।

৬। অ্যাসিটাইলকোলিন সিন্যাপটিক ক্লেফট পেরিয়ে পোস্টসিন্যাপটিক ঝিল্লিতে অবস্থিত রিসেপ্টরের উপর জমা হয়ে **অ্যাসিটাইলকোলিন রিসেপ্টর** যৌগ সৃষ্টি করে।

৭। যৌগটি পোস্টসিন্যাপটিক ঝিল্লির ভেদ্যতা বাড়িয়ে দেয়, ফলে Na^{+} ঝিল্লির ভেতর দিয়ে প্রবেশ করে এবং K^{+} ঝিল্লির বাইরে চলে আসে। অর্থাৎ Na^{+} ও K^{+} এর আদান-প্রদান ঘটে।

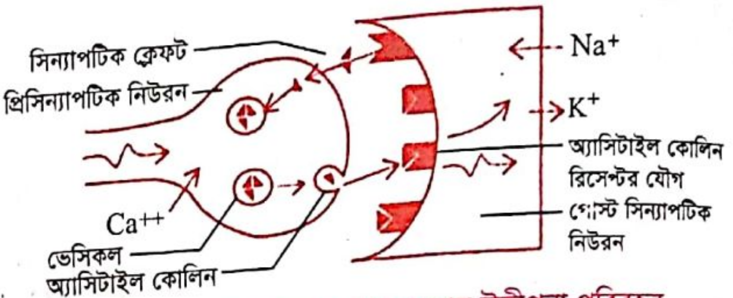

চিত্র : ৮.৫ গ : সিন্যাপসের মাধ্যমে স্নায়ু উদ্দীপনা পরিবহন

৮। এভাবে ক্রমশ **ক্রিয়া বিভব** (Action potential) এর সৃষ্টি হয়। ক্রিয়া বিভব অ্যাক্সন বা কোষদেহ বরাবর প্রবাহিত হয়। সিন্যাপসের একমুখী পরিবহন ধর্মের জন্য স্নায়ু প্রবাহ শুধু একদিকে অর্থাৎ নিউরনের অ্যাক্সন থেকে অন্য **নিউরনে** (Post-synaptic neurone) প্রবাহিত হয়। এভাবে স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে উদ্দীপনা পরিবাহিত হয়।

সিন্যাপসের মাধ্যমে স্নায়ু উদ্দীপনা প্রবাহের চিত্র–

স্নায়ু উদ্দীপনা → বহিঃকোষীয় তরল থেকেসিন্যাপটিকনবে Ca^{++}প্রবেশ → সিন্যাপটিক ভেসিকল → নিউরোট্রান্সমিটার পদার্থ (এসিটাইল কোলাইন) → প্রিসিন্যাপটিকমেমব্রেন→ সিন্যাপটিক ক্লেফট → পোস্ট সিন্যাপটিক মেমব্রেনে নিউরোট্রান্সমিটার রিসেপ্টর যৌগ তৈরি। বহিঃকোষীয় তরল থেকে Na^{+}প্রবেশ এবং K^{+} বের হয়ে যায় → স্নায়ু সংকেত পরিবহন।

৮.২ মস্তিষ্ক : গঠন ও কাজ(Brain:Structure and Functions)

করোটি দ্বারা সুরক্ষিত মেনিনজেসপর্দাবেষ্টিত কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের যে স্ফীত অংশ দেহের বিভিন্ন কাজ নিয়ন্ত্রণ করে তাকে **মস্তিষ্ক** বা **এনসেফালন** (brainor encephalon) বলে। ভ্রূণীয় বিকাশের সময় এক্টোডার্ম থেকে সৃষ্ট নিউরাল টিউবের সামনের অংশ স্ফীত হয়ে মস্তিষ্ক গঠন করে। মানব মস্তিষ্কই প্রাণিজগতের মধ্যে সবচেয়ে জটিল। এজন্য ব্রিটিশ শারীরতত্ত্ববিদ **Sir Charles Sherrington** মস্তিষ্ককে **'great ravelledknot'** বা **'বৃহৎ জট পাকানো গাঁট'** হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ মানুষের মস্তিষ্কের আয়তন প্রায় ১৫০০ সিসি, ও মহিলাদের প্রায় ১৩০০ সিসি এবং গড় ওজন প্রায় ১.৩৬ কেজি (কারও মতে ১.৩-১.৪ কেজি/১৩০০-১৪০০ গ্রাম) যা দেহের মোট ওজনের ২% গঠন করে। এতে প্রায় ১০০ বিলিয়ন (১ লক্ষ কোটি) **নিউরন** এবং ১ বিলিয়ন (১০০ কোটি) **নিউরোগ্লিয়া** কোষ থাকে।

মানুষের মস্তিষ্ক তিনটি প্রধান অংশ নিয়ে গঠিত। যথা– ক. **অগ্রমস্তিষ্ক** বা **প্রোসেনসেফালন** (forebrain or prosencephalon), খ. **মধ্যমস্তিষ্ক** বা **মেসেনসেফালন** (midbrain or mesencephalon) এবং গ. **পশ্চাৎমস্তিষ্ক** বা **রম্বেনসেফালন** (hindbrain or rhombencephalon)।

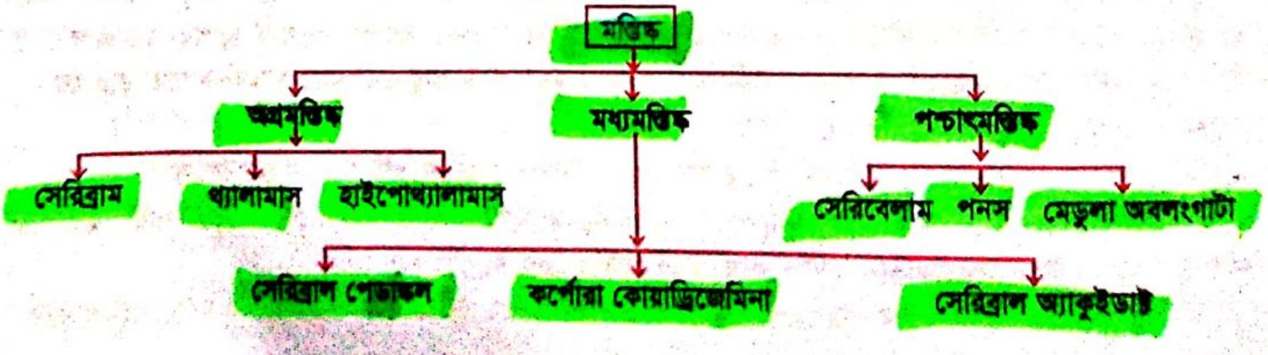

CamScanner

মস্তিষ্কের প্রধান অংশসমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা :

(ক) অগ্রমস্তিষ্ক বা প্রোসেনসেফালন (Forebrain or Prosencephalon) : মানুষের অগ্রমস্তিষ্ক তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত, যথা– ১. **গুরুমস্তিষ্ক** বা **সেরিব্রাম** (cerebral cortex or cerebrum), ২. **থ্যালামাস** (thalamus) ও ৩. **হাইপোথ্যালামাস** (hypothalamus)।

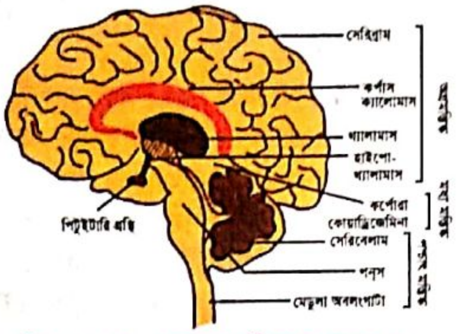

চিত্র ৮.৬ ক : মানুষের মস্তিষ্কের লম্বচ্ছেদ

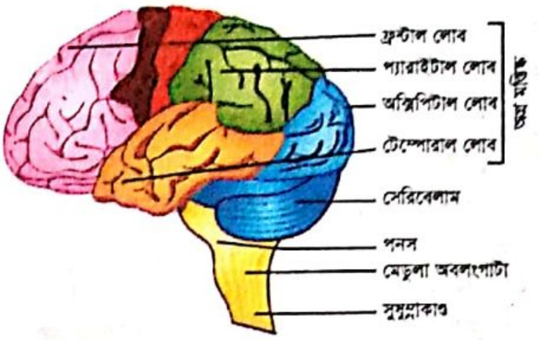

চিত্র ৮.৬ খ : মানুষের মস্তিষ্কের লোবসমূহ

১। সেরিব্রাম বা সেরিব্রাল কর্টেক্স বা টেলেনসেফালন (Cerebrum or Cerebral cortex or Telencephalon) **বা গুরুমস্তিষ্ক :** অগ্রমস্তিষ্কের যে অংশ করোটির বিস্তীর্ণ অঞ্চলজুড়ে অবস্থান করে এবং প্রাণীর বুদ্ধি, চিন্তা, স্মৃতি ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে তাকে **সেরিব্রাম** বা **গুরুমস্তিষ্ক** বলে। সেরিব্রাম (cerebrum) মানুষের মস্তিষ্কের সর্ববৃহৎ অংশ (মস্তিষ্কের ওজনের প্রায় ৮০%-ই হচ্ছে সেরিব্রাম) এবং মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশকে আবৃত করে রাখে। ইহা ধূসর পদার্থ (grey matter) অর্থাৎ নিউরনের কোষদেহ নিয়ে গঠিত।

সেরিব্রামটি **একটি অনুদৈর্ঘ্য মস্তিষ্ক** খাঁজ দিয়ে দুটি গোলার্ধে বিভক্ত। এদের যথাক্রমে **ডান সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার** ও **বাম সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার** (right and left cerebral hemisphere) বলে। গোলার্ধ দুটি **করপাস ক্যালোসাম** (corpus callosum) নামক স্নায়ুযোজক দিয়ে যুক্ত থাকে। ডান সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার দেহের বাম অংশ এবং বাম সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার দেহের ডান অংশ নিয়ন্ত্রণ করে। প্রতিটি সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ারের অভ্যন্তরে একটি তরলপূর্ণ প্রকোষ্ঠ থাকে। এদের **পার্শ্বীয় প্রকোষ্ঠ** (lateral ventricle) বলে। দুটি সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার এর আয়তন প্রায় ১৩৫০ মিলিমিটার (সিসি)। সেরিব্রামের বহির্দেশে অবস্থিত গভীর খাঁজগুলোকে **সালকাস** (sulcus) এবং ঢেউ খেলানো ভাঁজগুলোকে **জাইরাস** (gyrus) বলে। সেরিব্রামের বহির্ভাগকে **সেরিব্রাল কর্টেক্স** (cerebral cortex) বলে, এটি ৩ সে.মি. পুরু ও **গ্রে ম্যাটার** (grey matter)-এ গঠিত। আবার অন্তর্ভাগকে **সেরিব্রাল মেডুলা** (cerebral medulla) বলে, এটি **হোয়াইট ম্যাটার** (white matter)-এ গঠিত। উল্লেখ্য যে, সুষুম্নাকাণ্ডের ক্ষেত্রে হোয়াইট ম্যাটার বাইরের দিকে এবং গ্রে ম্যাটার ভেতরের দিকে থাকে। সেরিব্রামের প্রতিটি গোলার্ধ (সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার) চারটি খণ্ড বা **লোব** (lobe) নিয়ে গঠিত। যথা–

(i) **ফ্রন্টাল লোব** (Frontal lobe) : এটি সেরিব্রামের সামনের দিকে অবস্থিত। এখানে মননকেন্দ্র ও বাকশুরু কেন্দ্র অবস্থিত।

(ii) **প্যারাইটাল লোব** (Parietal lobe) : এটি সেরিব্রামের তালুতে অর্থাৎ মাঝামাঝি অঞ্চলে অবস্থিত। এখানে ভাব-নিয়ামক অঞ্চল অবস্থিত।

(iii) **টেম্পোরাল লোব** (Temporal lobe) : এটি সেরিব্রামের দু'পাশে কানের ঠিক ওপরে অবস্থিত। এখানে শ্রবণকেন্দ্র থাকে।

(iv) **অক্সিপিটাল লোব** (Occipital lobe) : এটি সেরিব্রামের পশ্চাৎভাগে অবস্থিত। এখানে দর্শন কেন্দ্র থাকে। পূর্বের **লিম্বিক লোব** (limbic lobe) বর্তমানে পৃথক লিম্বিকতন্ত্র নামে পরিচিত।

কাজ : (১) সেরিব্রাম বা গুরুমস্তিষ্ক দেহের বিভিন্ন অংশের ঐচ্ছিক কার্যকলাপ, পেশিটান, দেহভঙ্গি, বাকশক্তি ও স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে। (২) সকল সংবেদী তথ্যকে সমন্বয় ও প্রক্রিয়াজাত করে। (৩) স্পর্শ, ব্যথা, উত্তাপ, ঠাণ্ডা এবং স্বাদ, গন্ধ বা ঘ্রাণ, দৃষ্টি, শ্রবণ ইত্যাদি অনুভূতি গ্রহণ করে। (৪) সকল বুদ্ধিদীপ্ত কাজের জন্য যেমন– স্মৃতিশক্তি, বুদ্ধিমত্তা, চিন্তা, পরিকল্পনা, সৃজনশীলতা, বিচার, সহজাত প্রবৃত্তি, কর্ম প্রেরণা, ইচ্ছাশক্তি ইত্যাদির কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে।

চিত্র ৮.৬ গ : মানুষের মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের কাজ

CamScanner

২। **থ্যালামাস** (Thalamus) : মস্তিষ্কের তৃতীয় প্রকোষ্ঠের দু'পাশে সেরিব্রামের নিচে এবং মধ্যমস্তিষ্কের ওপরের শ্বেত বস্তুর মধ্যে যে দুটি ধূসর বর্ণের ডিম্বাকার অংশ থাকে তাদের থ্যালামাস বলে। থ্যালামাস সুবৃহৎ ডিম্বাকৃতি ধূসর পদার্থের (grey matter) স্নায়ুপুঞ্জ বিশেষ। প্রতিটি থ্যালামাসের দৈর্ঘ্য প্রায় ৪ সে.মি.। একে গুরুমস্তিষ্কের বা সেরিব্রামের প্রধান প্রবেশ পথ বা **সিংহদ্বার** বলা হয়। কারণ পরিবেশ ও দেহগত সবরকম সংবাদই থ্যালামাসের মাধ্যমে গুরুমস্তিষ্কে পৌছায়। একটি **স্নায়ুরজ্জুর** যোজক দ্বারা দুটি থ্যালামাস যুক্ত থাকে। প্রতিটি থ্যালামাসের সাথে ধূসর পদার্থে গঠিত একটি পিণ্ডাকার **বেসাল গ্যাংলিয়া** (basal ganglia) যুক্ত থাকে।

কাজ : (১) থ্যালামাস প্রেরক স্থান বা **রিলে কেন্দ্র** (relay station) হিসেবে কাজ করে। (২) ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ **প্রতিবর্তী কেন্দ্র** (reflex centre)। বিভিন্ন আবেগজনিত প্রতিক্রিয়া যেমন– ক্রোধ, পীড়ন ইত্যাদি থ্যালামাসের মাধ্যমেই সংঘটিত হয়। (৩) গুরুমস্তিষ্কের ফ্রন্টাল লোবের মাধ্যমে থ্যালামাস ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক আচরণের প্রকাশ ঘটায়। (৪) স্পর্শ, ব্যথা, চাপ, যন্ত্রণা ইত্যাদি অনুভূতির কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। (৫) গন্ধ ব্যতীত সকল সংবেদী স্নায়ু প্রবাহকে সমন্বয় করে সেরিব্রামে প্রেরণ করে। (৬) এটি বিভিন্ন ভিসেরাল ও সোমাটিক কাজের সমন্বয় কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত। (৭) থ্যালামাস দেহের জাগরণ এবং সতর্কীকরণ প্রতিক্রিয়াগুলো নিয়ন্ত্রণ করে। তাই এটি নিদ্রিত প্রাণীকে হঠাৎ জাগিয়ে তোলা এবং পরিবেশ সম্পর্কে তাকে সতর্ক করার ব্যাপারে বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করে।

৩। **হাইপোথ্যালামাস** (Hypothalamus) : মস্তিষ্কের তৃতীয় প্রকোষ্ঠ ও থ্যালামাসের তলদেশে অবস্থিত কতগুলো গুচ্ছ নিয়ে গঠিত অগ্রমস্তিষ্কের যে অংশ মানসিক আবেগ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে তাকে হাইপোথ্যালামাস বলে। পৃষ্ঠদেশে এটি থ্যালামাস ও সাব-থ্যালামাসের দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে। অঙ্কদেশে এটি পিটুইটারির সঙ্গে যুক্ত হয়। ইহা শ্বেত পদার্থ ও ধূসর পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত। এর ধূসর পদার্থ বিক্ষিপ্তভাবে স্নায়ুকেন্দ্র গঠন করে।

কাজ : (১)' হাইপোথ্যালামাস স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে। (২) ইহা দেহের উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ করে। (৩) ইহা মানসিক আবেগের, যেমন– হাসি, কান্না, ভয়, ক্রোধ, উত্তেজনা, ভালোলাগা, ঘৃণা, উদ্বেগ এবং দেহের ভারসাম্য ও হোমিওস্ট্যাটিক রক্ষা প্রভৃতির নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। (৪) ইহা ক্ষুধা, খাদ্য গ্রহণ, পরিতৃপ্তি ও স্থূলতা নিয়ন্ত্রণ করে। (৫) প্রাণীর যৌন আচরণে হাইপোথ্যালামাস প্রভাব বিস্তার করে। (৬) পাকস্থলীর এসিড ক্ষরণে হাইপোথ্যালামাসের প্রভাব সর্বজনগ্রাহ্য। (৭) নিউরোহরমোন উৎপন্ন করে ট্রপিক হরমোনের ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে। (৮) অক্সিটোসিন ও ভ্যাসোপ্রেসিন বা অ্যান্টিডাইইউরেটিক হরমোন (ADH) ক্ষরণ করে। (৯) এটি দিবা-রাত্রির ছন্দোময়তার সাথে ঘুম-জাগ্রত চক্র নিয়ন্ত্রণ করে। এ অবস্থাকে **জীবতাত্ত্বিক ঘড়ি** (biological clock) বলা হয়।

(খ) মধ্যমস্তিষ্ক বা মেসেনসেফালন (Midbrain or Mesencephalon) : হাইপোথ্যালামাসের নিচে এবং সেরিবেলামের সম্মুখে অবস্থিত ছোট ও সংকুচিত অংশটিকে মধ্যমস্তিষ্ক বলে। এটি অঙ্কদিকে দুটি নলাকার ও পুরু স্নায়ুরজ্জু এবং পৃষ্ঠদিকে দুটি গোলাকার খণ্ড নিয়ে গঠিত। প্রথম দুটিকে **সেরিব্রাল পেডাঙ্কল** (cerebral peduncle) এবং শেষের দুটোকে **কর্পোরা কোয়াড্রিজেমিনা** (corpora quadregemina) বলে। প্রতিটি কর্পোরা কোয়াড্রিজেমিনা আড়াআড়িভাবে বিভক্ত হয়ে মোট ৪টি খণ্ড গঠন করে। মধ্যমস্তিষ্কের অন্তর্ভাগের তরলপূর্ণ সরু নালি হচ্ছে **সেরিব্রাল অ্যাকুইডাক্ট** (cerebral aquiduct)। এটি ৩য় ও ৪র্থ মস্তিষ্কের গহ্বর বা ভেন্ট্রিকলকে যুক্ত করে।

কাজ : (১) এটি অগ্র ও পশ্চাৎমস্তিষ্কের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে। (২) বিভিন্ন দর্শন ও শ্রবণ তথ্যের সমন্বয় ঘটায় এবং প্রতিবেদন সৃষ্টি করে।

(গ) পশ্চাৎমস্তিষ্ক (Hindbrain or Rhombencephalon)

১। **সেরিবেলাম** (Cerebellum) বা **লঘুমস্তিষ্ক** : দুটি গোলার্ধ নিয়ে গঠিত পশ্চাৎমস্তিষ্কের যে সর্ববৃহৎ অংশ করোটির পশ্চাৎভাগে অবস্থান করে এবং প্রাণিদেহের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করে তাকে **সেরিবেলাম** বা **লঘুমস্তিষ্ক** বলে। গোলার্ধদুটি **ভার্মিস** (vermis) নামে একটি ক্ষুদ্র যোজক দ্বারা যুক্ত থাকে। এর বাইরের দিকে ধূসর পদার্থ এবং ভেতরের দিকে **শ্বেত পদার্থ** বিদ্যমান। পূর্ণ বয়স্ক মানুষে সেরিবেলামের গড় ওজন প্রায় ১৫০ গ্রাম।

কাজ : (১) দেহের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ এর প্রধান কাজ। (২) মাথা ও চোখের সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করে। (৩) ঐচ্ছিক চলাফেরা অর্থাৎ দেহভঙ্গি, পেশিটান নিয়ন্ত্রণ, দৌড়ানো, টাইপ করা, পিয়ানো বাজানো, দেহের সুষ্ঠু ও সাবলীল চলাফেরা, চলাফেরার দিক নির্ধারণ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে। (৪) দেহের সকল স্বয়ংক্রিয় কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে।

২। **পনস** (Pons) বা **যোজক** বা **সেতুমস্তিষ্ক** : পশ্চাৎমস্তিষ্কের যে অংশটি মধ্যমস্তিষ্কের সঙ্গে সেরিবেলাম (cerebellum) ও মেডুলা অবলংগাটার সংযোগ রক্ষা করে তাকে **পনস** বলে। পনসের অঙ্কীয়দেশ উত্তল এবং পৃষ্ঠীয় দেশ সমতল। এটি মস্তিষ্কের ৪র্থ ভেন্ট্রিকলের প্রাচীর গঠন করে। এতে ধূসর ও শ্বেত পদার্থ সমভাবে বিস্তৃত থেকে

CamScanner

একটি স্নায়ুজালিকা গঠন করে। এতে নিম্নগামী স্নায়ুতন্তু এবং কিছু সংখ্যক স্নায়ুগুচ্ছ বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান করে। তবে এর মধ্য দিয়ে মস্তিষ্ক ও স্পাইনাল কর্ডের মধ্য দিয়ে বিদ্যমান স্নায়ুতন্তুগুলো আড়াআড়িভাবে পরস্পরকে অতিক্রম করে। স্নায়ুতন্তুগুলোর এ ধরনের বিন্যাসের কারণে **মস্তিষ্কের বাম অংশ দেহের ডান অংশের এবং মস্তিষ্কের ডান অংশ দেহের বাম অংশের কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে।**

কাজ : (১) ইহা মূত্রনালির পেশির সংকোচন ঘটিয়ে মূত্র ত্যাগে সহায়তা করে। (২) চোয়ালের বিচলন, অক্ষিগোলকের পার্শ্ববিচলন, মুখের অভিব্যক্তি ও উত্তোলন (অর্থাৎ দেহের দু'পাশের পেশির কার্মকাণ্ড সমন্বয়) এবং লালাক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে। (৩) সেরিবেলাম, সুষুম্নাকাণ্ড ও মস্তিষ্কের অংশের মধ্যে রিলে স্টেশন হিসেবে কাজ করে। (৪) পনসের অ্যানিউস্টিক ও নিউমোট্যাক্সিক স্নায়ুকেন্দ্র বা শ্বাসকেন্দ্র শ্বাসক্রিয়ার হার নিয়ন্ত্রণে অংশগ্রহণ করে।

৩। মেডুলা অবলংগাটা (Medulla oblongata) : পন্‌সের নিচ থেকে শুরু করে সুষুম্নাকাণ্ডের অগ্রভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত যে অংশে বিভিন্ন প্রতিবর্তী ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে **মেডুলা অবলংগাটা** বলে। এটি মস্তিষ্কের সর্বাপেক্ষা পেছনের অংশ। এটি লম্বায় প্রায় ৩ সেমি., চওড়ায় ২ সেমি. এবং স্থূলত্বে ১.২ সেমি.। ইহা অনেকাংশে পিরামিডের ন্যায় দণ্ডাকার অংশ।

কাজ : (১) ইহা স্বাভাবিক হৃদ রক্তপ্রবাহ টান (cardiovascular tone) বজায় রাখে। (২) পৌষ্টিকনালির পেরিস্ট্যালসিস, রক্তবাহিকার সংকোচন, হৃৎস্পন্দন হার, রক্তচাপ, শ্বাসক্রিয়া, ঘাম নিঃসরণ, খাদ্যগ্রহণ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে। (৩) সুষুম্নাকাণ্ড ও মস্তিষ্কের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করে। (৪) বিভিন্ন প্রতিবর্তী (reflex) ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে, যেমন– কাশি (coughing), গলাধঃকরণ (swallowing), লালাক্ষরণ (salivary secretion), বমন (vomiting), মলমূত্র ত্যাগ ইত্যাদি। (৫) এটি প্রধানত ৮টি অর্থাৎ V, VI, VII, VIII, IX, X, XI ও XII) করোটিক স্নায়ুর উৎসস্থল হিসেবে কাজ করে সংশ্লিষ্ট স্নায়ুর কাজ নিয়ন্ত্রণ করে।

অগ্রমস্তিষ্ক, মধ্যমস্তিষ্ক ও পশ্চাৎমস্তিষ্কের মধ্যে পার্থক্য

অগ্রমস্তিষ্ক	মধ্যমস্তিষ্ক	পশ্চাৎমস্তিষ্ক
অগ্রমস্তিষ্কের আয়তন সবচেয়ে বড়।	আয়তন সবচেয়ে ছোট।	এর আয়তন অগ্রমস্তিষ্কের চেয়ে ছোট তবে মধ্যমস্তিষ্কের চেয়ে বড়।
এটি ৩টি অংশে বিভক্ত– ▪ সেরেব্রাম ▪ থ্যালামাস ও ▪ হাইপোথ্যালামাস	এটি ২টি অংশে বিভক্ত– ▪ মেসেনসেফালেন ▪ ডায়েনসেফালন	এটি ৩টি অংশে বিভক্ত– ▪ সেরেবেলাম ▪ পনস ▪ মেডুলা অবলংগাটা
অগ্রমস্তিষ্ক থেকে ২ জোড়া করোটিক স্নায়ু উৎপত্তি লাভ করে।	মধ্যমস্তিষ্ক থেকেও ২ জোড়া করোটিক স্নায়ু উৎপত্তি লাভ করে।	পশ্চাৎমস্তিষ্ক থেকে ৮ জোড়া করোটিক স্নায়ু সৃষ্টি হয়।
এটি বুদ্ধি ও স্মৃতিবোধের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে।	এটি দর্শন ও শ্রবণ তথ্যের সমন্বয় ঘটায়।	এটি দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে।

সেরিব্রাম ও সেরিবেলামের পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	সেরিব্রাম	সেরিবেলাম
১। অবস্থান	অগ্রমস্তিষ্কে।	পশ্চাৎ মস্তিষ্কে।
২। প্রধান অংশ	সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার ও কর্পাস ক্যালোসাম।	সেরিব্রাল পেডাঙ্কল ও ভার্মিস নামক যোজক কলা।
৩। বিভাজন	দুটি প্রতিসম গোলার্ধে বিভক্ত।	দুটি সমগোলার্ধে বিভক্ত।
৪। মস্তিষ্কের অংশ	মস্তিষ্কের প্রধান অংশ।	পশ্চাৎ মস্তিষ্কের সবচেয়ে বড় অংশ।
৫। ওজন	সেরিবেলামের চেয়ে প্রায় ৬ গুণ বেশি ওজন।	গড় ওজন প্রায় ১৫০ গ্রাম।
৬। লোব	চারটি লোবে বিভক্ত, যথা– প্যারাইটাল, ফ্রন্টাল, টেম্পোরাল ও অক্সিপিটাল লোব।	কোনো লোবে বিভক্ত নয়।
৭। কাজ	চিন্তা, বুদ্ধি, ইচ্ছাশক্তি ও সহজাত প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রক।	ঐচ্ছিক পেশির টান, নিয়ন্ত্রণ দেহের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ ও চলাফেরার দিক নির্ধারণ।

CamScanner

মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের কাজের ছক

মস্তিষ্কের প্রধান অংশ	মস্তিষ্কের সাব-অংশ	কাজ
অগ্রমস্তিষ্ক (প্রোসেনসেফালন)	গুরুমস্তিষ্ক (সেরিব্রাম)	১। বিভিন্ন চেষ্টীয় ক্রিয়ার কেন্দ্ররূপে কাজ করে। ২। প্রাণীর বাকশক্তি, বুদ্ধি, চিন্তা, স্মৃতি, সৃজনশীলতা, ইচ্ছাশক্তি, সহজাত প্রবৃত্তি, কর্মপ্রেরণা ইত্যাদি মানবিক বোধকে নিয়ন্ত্রণ করে। ৩। চাপ, তাপ, ব্যথা, দর্শন, শ্রবণ ইত্যাদি স্পর্শবোধগুলো নিয়ন্ত্রণ করে। ৪। খাদ্য গ্রহণ, রেচন, জনন ইত্যাদি বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয়, ক্রিয়াগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে। ৫। বিভিন্ন গ্রাহক থেকে আগত স্নায়ু উদ্দীপনা গ্রহণ করে ও ঐ অনুভূতিকে বিশ্লেষণ করে।
	থ্যালামাস	১। থ্যালামাস প্রেরক স্থান বা রিলে কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। ২। চাপ, তাপ, স্পর্শ, ব্যথা, টান, কম্পন ইত্যাদি অনুভূতির প্রেরক স্থান রূপে কাজ করে। ৩। গুরুমস্তিষ্কের সাহায্যে মানুষের ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। ৪। নিদ্রিত প্রাণীকে হঠাৎ জাগিয়ে তোলা এবং পরিবেশ সম্পর্কে তাকে সতর্ক করার ব্যাপারে বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করে।
	হাইপোথ্যালামাস	১। স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের কার্যাবলি ও দেহের উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ করে। ২। হাসি, কান্না, ভয়, ক্রোধ, উত্তেজনা, ভালোলাগা, ঘৃণা, উদ্বেগ ও দেহের ভারসাম্য প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করে। ৩। ক্ষুধা, খাদ্য গ্রহণ, পরিতৃপ্তি, স্থূলতা ও যৌন আকাঙ্ক্ষা নিয়ন্ত্রণ করে। ৪। পাকস্থলীর এসিড ক্ষরণ এবং নিউরোহরমোন উৎপন্ন করে ট্রপিক হরমোনের ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে। ৫। অক্সিটোসিন ও অ্যান্টিডাইইউরেটিক হরমোন (ADH) হরমোন ক্ষরণ করে। ৬। এটি দিবা-রাত্রির ছন্দোময়তার সাথে ঘুম-জাগ্রত চক্র নিয়ন্ত্রণ করে। এ অবস্থাকে জীবতাত্ত্বিক ঘড়ি (biological clock) বলা হয়।
মধ্যমস্তিষ্ক (মেসেনসেফালন)	মেসেনসেফালন	১। অগ্র ও পশ্চাৎমস্তিষ্কের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে। ২। বিভিন্ন দর্শন ও শ্রবণ তথ্যের সমন্বয় ঘটায় এবং প্রতিবেদন সৃষ্টি করে।
পশ্চাৎমস্তিষ্ক (রম্বেনসেফালন)	সেরিবেলাম	১। দৈহিক ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করে। ২। মাথা ও চোখের সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করে। ৩। ঐচ্ছিক চলাফেরা অর্থাৎ দেহভঙ্গি, পেশিটান, দেহের সুষ্ঠ ও সাবলীল চলাফেরা, চলাফেরার দিক নির্ধারণ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে। ৪। দেহের সকল স্বয়ংক্রিয় কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে।
	পনস	১। সেরিবেলাম, সুষুম্নাকাণ্ড ও মস্তিষ্কের অংশের মধ্যে রিলে স্টেশন হিসেবে কাজ করে। ২। ইহা চোয়ালের সঞ্চালন, অক্ষিগোলকের সঞ্চালন ও মুখের অভিব্যক্তি অর্থাৎ দেহের দুপাশের পেশির কার্মকাণ্ড সমন্বয় করে এবং লালাক্ষরণ, মূত্রত্যাগ, শ্বসন ইত্যাদি কাজগুলো নিয়ন্ত্রণ করে।
	মেডুলা অবলংগাটা	১। সুষুম্নাকাণ্ড ও মস্তিষ্কের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করে। ২। বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজ, যেমন– পৌষ্টিকনালির পেরিস্ট্যালসিস, রক্তবাহিকার সংকোচন, হৃৎস্পন্দন হার, রক্তচাপ, শ্বাসক্রিয়া, ঘাম নিঃসরণ, খাদ্যগ্রহণ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে। ৩। বিভিন্ন প্রতিবর্তী ক্রিয়া (যেমন– কাশি, বমন, লালাক্ষরণ ইত্যাদি) নিয়ন্ত্রণ করে।

মস্তিষ্কের প্রকোষ্ঠ বা গহ্বর বা ভেন্ট্রিকল (Ventricle of Brain)

মস্তিষ্কের গঠন নিরেট নয়, এর অভ্যন্তর ভাগে তরলপূর্ণ গহ্বর থাকে। এ গহ্বর কয়েকটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। মস্তিষ্কের এসব তরলপূর্ণ গহ্বরকে **নিলয়** বা **ভেন্ট্রিকল** (ventricle) বলে। মস্তিষ্কে মোট ৪টি ভেন্ট্রিকল থাকে। এদের যথাক্রমে ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ ভেন্ট্রিকল বলা হয়। ১ম ও ২য় ভেন্ট্রিকলকে **পার্শ্বীয়** বা **ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকলও** বলা হয়। মস্তিষ্কের ভেন্ট্রিকলগুলো **সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড** (cerebrospinal fluid, CSF) বা **সুষুম্নারস** দ্বারা পূর্ণ থাকে।

১। **পার্শ্বীয় ভেন্ট্রিকল** (Lateral ventricle): অগ্রমস্তিষ্কের দুটি সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ারের অভ্যন্তরের প্রকোষ্ঠদ্বয়কে (১ম ও ২য় ভেন্ট্রিকল) পার্শ্বীয় বা **ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকল** বলে। এরা পৃথকভাবে মধ্যমস্তিষ্কের ৩য় ভেন্ট্রিকলের সঙ্গে দুটি ইন্টারভেন্ট্রিকুলার ছিদ্র বা **ফোরামেন অব মনরো** (foramen of monro) দিয়ে যুক্ত থাকে।

২। **তৃতীয় ভেন্ট্রিকল** (Third ventricle): অগ্রমস্তিষ্কের শেষভাগের অর্থাৎ হাইপোথ্যালামাসের গহ্বরটিকে **৩য় ভেন্ট্রিকল** বলে। ৩য় ভেন্ট্রিকল ৪র্থ ভেন্ট্রিকলের সঙ্গে **সেরেব্রাল অ্যাকুইডাক্ট** (cerebral aqueduct or aqueduct of Sylvius) দ্বারা যুক্ত থাকে।

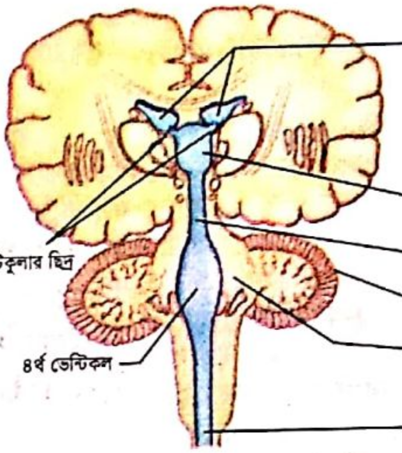

চিত্র- ৮.৭ : মস্তিষ্কের গহ্বর বা ভেন্ট্রিকল

৩। **চতুর্থ ভেন্ট্রিকল** (Fourth ventricle) : এটি পশ্চাৎমস্তিষ্কের মেডুলা অবলংগাটায় অবস্থিত। এটি পশ্চাৎ দিকে সুষুম্নাকাণ্ডের কেন্দ্রীয় নালিতে উন্মুক্ত থাকে।

মেনিনজেস (Meninges)

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র একটি দৃঢ় ও মজবুত আবরণ দিয়ে আবৃত থাকে, যা করোটিকা ও মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে সংরক্ষিত থাকে। একে **মেনিনজেস** বলে। মেনিনজেস তিনটি ঝিল্লি নিয়ে গঠিত। বাইরের দিক থেকে ভিতরের দিকে ঝিল্লি তিনটি যথাক্রমে– **ড্যুরা ম্যাটার, অ্যারাকনয়েড ম্যাটার** ও **পায়া ম্যাটার**।

১। **ড্যুরা ম্যাটার বা প্যাকাইমেনিক্স বা ড্যুরা** (Dura matter or Pachymeninx or Dura): এটি মেনিনজেসের বহিঃস্থতম, সুদৃঢ় ঝিল্লি। এতে শিরা ও সাইনাস প্রলম্বিত থাকে। এটি মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডের সাথে লাগানো থাকে। তবে করোটিকা ও কশেরুকার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে লেগে থাকে। এটি ভ্রূণীয় মেসোডার্ম থেকে সৃষ্টি হয়। মস্তিষ্কের ক্ষেত্রে এটি দ্বিস্তরী কিন্তু সুষুম্নাকাণ্ডে একস্তরী। এর বাইরের ও ভেতরের ফাঁকা স্থানকে যথাক্রমে **এপিড্যুরাল** (epidural) ও **সাবড্যুরাল** (subdural) স্পেস বলে। [অস্ত্রোপচারের সময় এপিড্যুরাল স্পেসে ইনজেকশনের মাধ্যমে চেতনানাশক প্রবেশ করিয়ে মানুষকে অজ্ঞান করা (অ্যানেসথেসিয়া) হয়।]

২। **অ্যারাকনয়েড ম্যাটার** (Arachnoid matter) : এটি মেনিনজেসের মধ্যবর্তী ঝিল্লি অর্থাৎ ড্যুরা ম্যাটার ও পায়া ম্যাটার এর মধ্যবর্তী ঝিল্লি। এটি প্রকৃতপক্ষে **সাব-অ্যারাকনয়েড স্পেস** (subarachnoid space) নামে একটি ফাঁকা স্থান, যোজক কলার সূত্র, রক্তবাহিকা ও **সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড** (cerebrospinal fluid) নিয়ে গঠিত। কোনো কোনো স্থানে সাব-অ্যারাকনয়েড স্পেস বেশি প্রসারিত থাকে। এদের **সিস্টারনি** (cisternae) বলে।

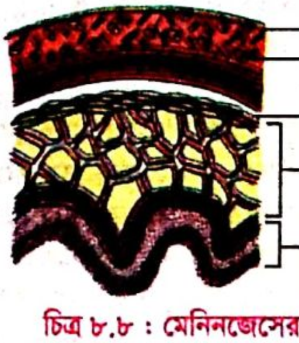

চিত্র ৮.৮ : মেনিনজেসের প্রস্থচ্ছেদ

৩। **পায়া ম্যাটার** (Pia mater) : এটি মেনিনজেসের অন্তঃস্থতম পাতলা ঝিল্লি। এটি স্নায়ুকলার (nerve tissue) সংলগ্ন থেকে মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডের বহির্তলের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে লেগে থাকে।

মেনিনজেসের কাজ : কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে যান্ত্রিক আঘাত ও জীবাণুর সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে পুষ্টি পদার্থ সরবরাহ করে। সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড ক্ষরণ করে। মেনিনজেস নিজে জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হলে যে রোগ সৃষ্টি হয় তাকে **মেনিনজাইটিস** (meningitis) বলে। ব্যাকটেরিয়া (প্রধানত *Neisseria meningitidis*) দ্বারা সাধারণত মেনিনজেস আক্রান্ত হয়।

CamScanner

সুষুম্নাকাণ্ড (Spinal cord)

কশেরুকায় গঠিত মেরুদণ্ডের গহ্বরে সুরক্ষিত **সুষুম্নাশীর্ষক** (medulla oblongata) থেকে আরম্ভ করে সুষুম্নানালির মধ্য দিয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় কটিদেশীয় কশেরুকা পর্যন্ত বিস্তৃত ফাঁপা গোলাকার রজ্জুর মতো সরু স্নায়ুদণ্ডকে **সুষুম্নাকাণ্ড বা স্পাইনাল কর্ড** (spinal cord) বলে।

গঠন : পুরুষ মানুষের সুষুম্নাকাণ্ডের দৈর্ঘ্য প্রায় ১৮ ইঞ্চি বা ৪৫ সেমি ও স্ত্রীলোকের প্রায় ৪৩ সে.মি.। এটি ১.২৫ সে.মি. প্রশস্ত এবং ৩১টি খণ্ডক নিয়ে গঠিত। এর ওজন প্রায় ৩৫ গ্রাম। সুষুম্নাকাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদে নিম্নলিখিত অংশগুলো দেখা যায় :

১। **কেন্দ্রীয় নালি** (Central canal) : সুষুম্নাকাণ্ডের কেন্দ্রে যে ছোট গহ্বর রোমশ কোষ দ্বারা আবৃত তাকে **কেন্দ্রীয় নালি** বলে।

২। **সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড** (Cerebrospinal fluid-CSF) : নিউরোসিল (মস্তিষ্কের ভেন্ট্রিকল ও সুষুম্নাকাণ্ডের কেন্দ্রীয় নালি) ও সাব-অ্যারাকনয়েড স্পেস যে স্বচ্ছ, বর্ণহীন ও পরিবর্তিত কলারস দ্বারা পূর্ণ থাকে, তাকে **সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড বা মস্তিষ্ক-সুষুম্না রস** বলে। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে লসিকার পরিবর্তে CSF থাকে। পূর্ণবয়স্ক একজন মানুষের দেহে এর পরিমাণ প্রায় **১৪০-১৫০ মিলিলিটার**। দৈনন্দিন ক্ষরণের পরিমাণ প্রায় ৫০০ মিলিলিটার। এটি সর্বদা পরিবর্তনশীল অর্থাৎ এটি সর্বদা ক্ষরিত ও শোষিত হয়। এর pH ৭.৩৩ এবং আপেক্ষিক গুরুত্ব ১.০০৪-১.০০৬। মস্তিষ্কের ভেন্ট্রিকল ও কেন্দ্রীয় নালিতে অনুপ্রবিষ্ট ধমনি থেকে এই তরল উৎপন্ন হয় এবং শিরাব্যবস্থার মাধ্যমে এই অঞ্চল থেকে নির্গত হয়। এটি সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ারের প্রাচীর থেকেও ক্ষরিত হয় এবং মেনিনজেস CSF ক্ষরণে বিশেষ ভূমিকা রাখে। এর উপাদান কলয়েডমুক্ত প্লাজমা উপাদানের মতোই, তবে কয়েকটি ক্রিস্টালয়েডের পরিমাণে পার্থক্য থাকে।

কাজ : (১) এটি কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে যান্ত্রিক আঘাত ও জীবাণুর সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে; (২) মস্তিষ্ককে ভাসিয়ে রেখে এর ওজন হ্রাস করে; (৩) কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে পুষ্টি পদার্থ সরবরাহ, গ্যাস বিনিময়, বর্জ্য নিষ্কাশন প্রভৃতি কার্যাবলি সম্পাদন করে; (৪) করোটি মধ্যস্থ চাপকে একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় বজায় রাখে; (৫) এটি মস্তিষ্ক থেকে ইপিনেফ্রাইন ও কিছু ওষুধ অপসারণ করে।

৩। **ধূসর বস্তু বা গ্রে ম্যাটার** (Grey matter) : সুষুম্নাকাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদে সেন্ট্রাল ক্যানালের চারদিকে ইংরেজি **'H'** বর্ণমালার আকৃতিবিশিষ্ট যে অংশটি দেখা যায় তাকে **ধূসর বস্তু বা গ্রে ম্যাটার** বলে। নিউরন দ্বারা ধূসর বস্তু গঠিত।

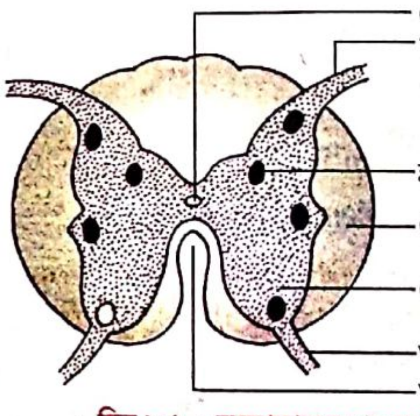

চিত্র ৮.৯ : সুষুম্নাকাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ

৪। **শ্বেত বস্তু বা হোয়াইট ম্যাটার** (White matter) : প্রধানত মায়েলিন আবরণযুক্ত স্নায়ুতন্ত্র ও নিউরোগ্লিয়া কোষ নিয়ে গঠিত সুষুম্নাকাণ্ডের বাইরের সাদা অংশকে **শ্বেত বস্তু বা হোয়াইট ম্যাটার** বলে।

৫। **পৃষ্ঠীয়মূল বা ডরসাল রুট** (Dorsal root) : স্পাইনাল কর্ডের পৃষ্ঠদেশে অন্তর্বাহী স্নায়ুতন্ত্র যুক্ত থাকে বলে এই স্থানকে **ডরসাল রুট** বা **পৃষ্ঠীয় মূল** বলে।

৬। **অঙ্কীয়মূল বা ভেন্ট্রাল রুট** (Ventral root) : বহির্বাহী স্নায়ুতন্ত্র স্পাইনাল কর্ড থেকে যে স্থানে নির্গত হয়, তাকে **ভেন্ট্রাল রুট** বা **অঙ্কীয় মূল** বলে।

সুষুম্নাকাণ্ডের কাজ (Functions of spinal cord)

১। বাইরের অনুভূতি গ্রহণ ও মস্তিষ্কে প্রেরণ।
২। মস্তিষ্কের নির্দেশে পেশি ও আন্তঃযন্ত্র গ্রন্থিগুলোতে প্রেরণ।
৩। স্নায়বিক কার্যসমূহের সমন্বয় ঘটানো (অর্থাৎ সুষুম্না স্নায়ু ও মস্তিষ্কের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম) ও প্রতিবর্তী ক্রিয়ার কেন্দ্রস্থল হিসেবে কাজ করে।
৪। এটি হাঁটা-চলার সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যথা, চাপ ও তাপ অনুভূতি গ্রহণে সহায়তা করে।

গ্রে ম্যাটার ও হোয়াইট ম্যাটার এর মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	গ্রে ম্যাটার বা ধূসর পদার্থ	হোয়াইট ম্যাটার বা শ্বেত পদার্থ
১। বর্ণ	ধূসর বর্ণের।	শ্বেত বর্ণের।
২। গঠন	কোষদেহ, ডেনড্রাইট এবং সিন্যাপস নিয়ে গঠিত।	নিউরনের অ্যাক্সন নিয়ে গঠিত।
৩। অবস্থান	মস্তিষ্কে গ্রে ম্যাটারের নিচে হোয়াইট ম্যাটার থাকে।	সুষুম্নাকাণ্ডে হোয়াইট ম্যাটারের নিচে গ্রে ম্যাটার থাকে।

CamScanner

৮.৩ করোটিক স্নায়ু (Cranial nerves)

মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ থেকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্ট যেসব প্রান্তীয় স্নায়ুসমূহ করোটির বিভিন্ন ছিদ্রপথে বের হয়ে দেহের বিভিন্ন অঙ্গে বিস্তার লাভ করে তাদের করোটিক স্নায়ু বলে। মানুষের করোটিক স্নায়ু ১২ জোড়া। এদের সম্মুখ অংশ থেকে পরপর রোমান ক্যাপিটাল সংখ্যা I হতে XII দ্বারা সূচিত করা হয়।

কার্যপ্রকৃতিভেদে এদের তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যথা–

১। **সংবেদী বা সংজ্ঞাবহ বা অন্তর্বাহী স্নায়ু (Sensory nerve)**: যেসব স্নায়ুর মাধ্যমে উদ্দীপনা (impulse) রিসেপ্টর বা সংবেদী অঙ্গ থেকে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে বাহিত হয় তাদের সংবেদী বা সংজ্ঞাবহ স্নায়ু বলে। সংবেদী স্নায়ু ৩ জোড়া। যেমন– অলফ্যাক্টরি (I), অপটিক (II) ও অডিটরি (VIII)।

২। **চেষ্টীয় বা মোটর বা বহির্বাহী বা আজ্ঞাবাহী স্নায়ু (Motor nerve)** : যেসব স্নায়ুর মাধ্যমে সাড়া (response) বা নির্দেশ কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে ইফেক্টরে বা নির্দিষ্ট অঙ্গে পৌছায় তাদের চেষ্টীয় বা মোটর স্নায়ু বলে। চেষ্টীয় স্নায়ু ৫ জোড়া। যেমন– অকুলোমোটর (III), ট্রকলিয়ার (IV), অ্যাবডুসেন্স (VI), স্পাইনাল অ্যাকসেসরি (XI) ও হাইপোগ্লোসাল (XII)।

৩। **মিশ্র বা মিক্সড স্নায়ু (Mixed nerve)** : যেসব স্নায়ুতে সংবেদী ও চেষ্টীয় উভয় প্রকার স্নায়ুতন্তু থাকে, ফলে স্নায়ু স্পন্দন উভয়দিকেই পরিবাহিত হয় তাদের মিশ্র বা মিক্সড স্নায়ু বলে। মিশ্র স্নায়ু ৪ জোড়া। যেমন– ট্রাইজেমিনাল (V), ফেসিয়াল (VII), গ্লোসোফ্যারিঞ্জিয়াল (IX) ও ভেগাস (X)।

ক্রমিক বিস্তৃতি সংখ্যা

(I)	নাসিকা
(II)	রেটিনা
(III)	চক্ষুপেশি
(IV)	চক্ষুপেশি
(V)	নেত্রপল্লব, ঊর্ধ্বোষ্ঠ, নিম্নোষ্ঠ ও চোয়াল
(VI)	চক্ষুপেশি
(VII)	মুখবিবর ও বহিঃকর্ণ
(VIII)	অন্তঃকর্ণ
(IX)	জিহ্বা ও গলবিল
(X)	হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, পাকস্থলী, ল্যারিংক্স
(XI)	গলবিল, স্বরযন্ত্র, গ্রীবা ও কাঁধ
(XII)	জিহ্বা

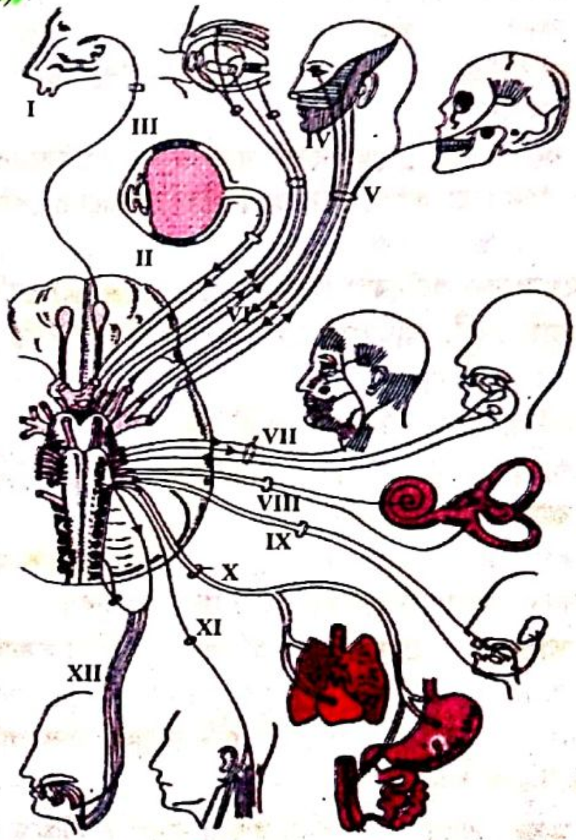

চিত্র ৮.১০ : করোটিক স্নায়ুর উৎপত্তি ও বিস্তৃতির চিত্ররূপ

মানুষের করোটিক স্নায়ুসমূহের নাম, উৎপত্তি, প্রকৃতি, বিস্তার ও কাজ বর্ণনা করা হলো–

(I) অলফ্যাক্টরি স্নায়ু (Olfactory nerve): অগ্রমস্তিষ্কের অলফ্যাক্টরি লোবের শীর্ষদেশ (অগ্রমস্তিষ্কের অঙ্কীয়দেশ) থেকে উৎপন্ন হয়ে নাসিকা গহ্বরের মিউকাস ঝিল্লিতে বিস্তৃত হয়। এরা সংবেদী প্রকৃতির স্নায়ু।

কাজ : মস্তিষ্কে ঘ্রাণ উদ্দীপনা বহন করে।

(II) অপটিক স্নায়ু (Optic nerve): অগ্রমস্তিষ্কের অপটিক লোবের অঙ্কীয়দেশ (অগ্রমস্তিষ্কের অঙ্কীয়দেশ) থেকে উৎপন্ন হয়ে X আকৃতির আড়াআড়ি **অপটিক কায়াজমা** (optic chiasma) সৃষ্টি করে চোখের রেটিনাতে বিস্তৃত হয়। এরাও সংবেদী প্রকৃতির স্নায়ু।

কাজ : চোখ থেকে দর্শনের অনুভূতি মস্তিষ্কে বহন করে আনে অর্থাৎ দর্শনে সাহায্য করে।

(III) অকুলোমোটর স্নায়ু (Oculomotor nerve): মধ্যমস্তিষ্কের অঙ্কীয়দেশ থেকে উৎপন্ন হয়ে চোখে প্রবেশ করে এবং চোখের **ইনফিরিয়র অবলিক** (inferior oblique) ও **তিনটি রেকটাস** (superior, inferior ও medial rectus) পেশিতে বিস্তৃত হয়। এরা চেষ্টীয় প্রকৃতির স্নায়ু।

কাজ : অক্ষিগোলকের সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করে।

(IV) ট্রকলিয়ার স্নায়ু (Trochlear nerve) বা **প্যাথেটিক স্নায়ু** (Pathetic nerve): মধ্যমস্তিষ্কের পৃষ্ঠ-পার্শ্বদেশ থেকে উৎপন্ন হয়ে **সুপিরিয়র অবলিক** (superior oblique) নামক চক্ষু পেশিতে বিস্তৃত হয়। এটি সবচেয়ে পাতলা ও **ক্ষুদ্র করোটিক স্নায়ু**। এরা চেষ্টীয় প্রকৃতির স্নায়ু।

কাজ : অক্ষিগোলকের সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করে।

(V) ট্রাইজেমিনাল স্নায়ু (Trigeminal nerve): এরা মেডুলা অবলংগাটার অগ্র-পার্শ্বদেশ থেকে উৎপন্ন হয়ে, ৩টি শাখায় বিভক্ত হয়। যথা–

(ক) অপথ্যালমিক (Opthalmic) : এটি **সবচেয়ে ছোট শাখা**। এ শাখা উর্ধ্ব অক্ষিপল্লব, মস্তকের অগ্রভাগের ত্বক ও নাসিকার মিউকাস প্রাচীরে বিস্তৃত হয়। এরা সংবেদী প্রকৃতির।

কাজ : উল্লেখিত অংশগুলো থেকে অনুভূতি মস্তিষ্কে বহন করে।

(খ) ম্যাক্সিলারি (Maxillary) : এ শাখা নিম্ন অক্ষিপল্লব, উর্ধ্ব ওষ্ঠ ও উর্ধ্ব চোয়ালের মিউকাস ঝিল্লিতে বিস্তৃত হয়। এটিও সংবেদী প্রকৃতির।

কাজ : উল্লেখিত অংশগুলো থেকে অনুভূতি মস্তিষ্কে বহন করে।

(গ) ম্যান্ডিবুলার (Mandibular) : এ শাখা নিম্ন চোয়াল, মুখবিবরের তলদেশের পেশি ও ত্বকে বিস্তৃত হয়। এটি মিশ্র প্রকৃতির।

কাজ : এই স্নায়ুর সংবদী কাজ হলো মুখবিবরের পেশি ও ত্বকের চাপ, স্পর্শ, উত্তাপ ইত্যাদি অনুভূতি মস্তিষ্কে বহন করা এবং চেষ্টীয় কাজ হলো চোয়ালের পেশির সঞ্চালন।

(VI) অ্যাবডুসেন্স স্নায়ু (Abducens nerve) : মেডুলা অবলংগাটার অঙ্কীয়-পার্শ্বদেশ থেকে উৎপন্ন হয়ে অক্ষিগোলকের **ল্যাটারাল রেকটাস** (lateral rectus) পেশিতে বিস্তৃত হয়। এটি চেষ্টীয় প্রকৃতির স্নায়ু।

কাজ : এটি অক্ষিগোলকের সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করে।

(VII) ফেসিয়াল স্নায়ু (Facial nerve) : মেডুলা অবলংগাটার পার্শ্বদেশ থেকে উৎপন্ন হয়ে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন অঙ্গে বিস্তৃত হয়। এটি মিশ্র প্রকৃতির স্নায়ু। এর শাখা দুটি হলো–

(ক) প্যালাটাইন (Palatine) : এটি মুখবিবরের ছাদে বিস্তৃত হয়। এটি সংবেদী প্রকৃতির।

কাজ : স্বাদ গ্রহণ করে।

(খ) হ্যায়োম্যান্ডিবুলার (Hyomandibular) : এটি শাখা মুখবিবরের তলদেশ বরাবর অগ্রসর হয়ে কর্ণপটহ, মুখবিবর ও নিম্ন চোয়ালে বিস্তৃত হয়। এটি মিশ্র প্রকৃতির।

কাজ : স্বাদ গ্রহণ, মুখের অভিব্যক্তি ও গ্রীবা সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করে।

(VIII) অডিটরি স্নায়ু (Auditory nerve) বা **অ্যাকাউস্টিক** বা **ভেস্টিবুলোকক্লিয়ার স্নায়ু** (Acoustic or Vestibulocochlear nerve) : এটি মেডুলা অবলংগাটায় পার্শ্বদেশ থেকে উৎপন্ন হয়ে অন্তঃকর্ণে বিস্তৃত হয়। এটি সংবেদী প্রকৃতির স্নায়ু।

কাজ : শ্রবণ ও ভারসাম্য রক্ষার অনুভূতি মস্তিষ্কে বহন করে।

(IX) গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল স্নায়ু (Glossopharyngeal nerve): মেডুলা অবলংগাটার পার্শ্বদেশ থেকে উৎপন্ন হয়ে লালাগ্রন্থি, জিহ্বা ও গলবিলে বিস্তৃত হয়। এটি মিশ্র প্রকৃতির স্নায়ু।

কাজ : স্বাদ গ্রহণ, জিহ্বা ও গলবিলের সঞ্চালন এবং লালাক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে।

(X) ভেগাস স্নায়ু (Vagus nerve) বা **নিউমোগ্যাসট্রিক স্নায়ু** (Pneumogastric nerve) : এটি মিশ্র প্রকৃতির স্নায়ু। **সবচেয়ে দীর্ঘ করোটিক স্নায়ু**। মেডুলা অবলংগাটার পার্শ্বদেশ থেকে উৎপন্ন হয়ে, ৪টি শাখায় বিভক্ত হয়। যেমন–

(ক) ল্যারিঞ্জিয়াল (Laryngeal) : এটি স্বরযন্ত্রে বিস্তৃত হয়। মিশ্র প্রকৃতির।

কাজ : স্বরযন্ত্রের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে।

(খ) কার্ডিয়াক (Cardiac) : এটি হৃৎপিণ্ডে বিস্তৃত হয়। মিশ্র প্রকৃতির।

কাজ : হৃৎপিণ্ডের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে।

CamScanner

(গ) গ্যাস্ট্রিক (Gastric) : এটি পাকস্থলীতে বিস্তৃত হয়। মিশ্র প্রকৃতির।
কাজ : পাকস্থলীর কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে।

(ঘ) পালমোনারি (Pulmonary) : এটি ফুসফুসে বিস্তৃত হয়। মিশ্র প্রকৃতির।
কাজ : ফুসফুসের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে।

(XI) স্পাইনাল অ্যাকসেসরি স্নায়ু (Spinal accessory nerve) : মেডুলা অবলংগাটার পার্শ্বদেশ (মেঝে) থেকে উৎপন্ন হয়ে গলবিল, স্বরযন্ত্র, গ্রীবা ও কাঁধ অঞ্চলে বিস্তৃত হয়। এটি চেষ্টীয় প্রকৃতির স্নায়ু।

কাজ : এটি সংশ্লিষ্ট অঙ্গের পেশি সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করে।

(XII) হাইপোগ্লোসাল স্নায়ু (Hypoglossal nerve) : এটি মেডুলা অবলংগাটার পার্শ্বদেশ থেকে উৎপন্ন হয়ে জিহ্বাতে বিস্তৃত হয়। এটি চেষ্টীয় প্রকৃতির স্নায়ু।

কাজ : জিহ্বার সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করে।

করোটিক স্নায়ুর নাম, উৎপত্তি, বিস্তৃতি, প্রকৃতি ও কাজের ছক

স্নায়ুর নাম	উৎপত্তি ও শাখা	প্রকৃতি	বিস্তৃতি	কাজ
I. অলফ্যাক্টরি (Olfactory)	অগ্রমস্তিষ্কের অলফ্যাক্টরি লোবের শীর্ষদেশ	সংবেদী স্নায়ু (sensory nerve)	নাসিকার মিউকাস পর্দা	মস্তিষ্কে ঘ্রাণ উদ্দীপনা বহন করে।
II. অপটিক (Optic)	অগ্রমস্তিষ্কের অপটিক লোবের অঙ্কীয়দেশ	সংবেদী স্নায়ু	চোখের রেটিনা	দর্শনে সাহায্য করে।
III. অকুলোমোটর (Oculomotor)	মধ্যমস্তিষ্কের অঙ্কীয়দেশ	চেষ্টীয় স্নায়ু (motor nerve)	চোখের (inferior oblique এবং superior, inferior ও medial rectus) পেশিতে	অক্ষিগোলকের সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করে।
IV. ট্রকলিয়ার (Trochlear)/ প্যাথেটিক স্নায়ু	মধ্যমস্তিষ্কের পৃষ্ঠ-পার্শ্বদেশ	চেষ্টীয় স্নায়ু	চোখের (superior oblique) পেশিতে	অক্ষিগোলকের সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করে।
V. ট্রাইজেমিনাল (Trigeminal)	মেডুলা অবলংগাটার অগ্র-পার্শ্বদেশ। **শাখা :** i.অপথ্যালমিক (সংবেদী) ii.ম্যাক্সিলারি (সংবেদী) iii.ম্যান্ডিবুলার (মিশ্র)	মিশ্র স্নায়ু (mixed nerve)	অক্ষিপল্লব, নাসিকার পর্দা, ঊর্ধ্ব ও নিম্নচোয়াল, মুখবিবরের অঙ্কীয় দেশের পেশি	সংশ্লিষ্ট অঙ্গ থেকে সংবেদন মস্তিষ্কে বহন করে এবং সংশ্লিষ্ট অঙ্গ সঞ্চালন ও তাপ, চাপ ও স্পর্শ সঞ্চালন করে।
VI. অ্যাবডুসেন্স (Abducens)	মেডুলা অবলংগাটার অঙ্কীয়-পার্শ্বদেশ	চেষ্টীয় স্নায়ু	চোখের (lateral rectus) পেশিতে	অক্ষিগোলকের সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করে।
VII. ফেসিয়াল (Facial)	মেডুলা অবলংগাটার পার্শ্বদেশ। **শাখা :** i. প্যালাটাইন (সংবেদী) ii. হায়োম্যান্ডিবুলার (মিশ্র)	মিশ্র স্নায়ু	মুখমণ্ডল, কর্ণপটহ ও নিম্ন চোয়াল	সংবেদীরূপে স্বাদ গ্রহণ করে এবং মোটর স্নায়ুরূপে মৌখিক অভিব্যক্তি, চর্বণ ও গ্রীবা সঞ্চালন করে।
VIII. অডিটরি (Auditory) (অ্যাকাউস্টিক)	মেডুলা অবলংগাটার পার্শ্বদেশ	সংবেদী স্নায়ু	অন্তঃকর্ণ	শ্রবণ ও ভারসাম্য রক্ষার অনুভূতি মস্তিষ্কে বহন করে আনে।
IX. গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল (Glosso pharyngeal)	মেডুলা অবলংগাটার পার্শ্বদেশ	মিশ্র স্নায়ু	জিহ্বা ও গলবিল	স্বাদ গ্রহণ, জিহ্বা ও গলবিলের সঞ্চালনে সহায়তা করে।

স্নায়ুর নাম	উৎপত্তি ও শাখা	প্রকৃতি	বিস্তৃতি	কাজ
X. ভেগাস (Vagus) (নিউমোগ্যাসট্রিক)	মেডুলা অবলংগাটার পার্শ্বদেশ, শাখা : i. ল্যারিঞ্জিয়াল (মিশ্র) ii. কার্ডিয়াক (মিশ্র) iii. গ্যাস্ট্রিক (মিশ্র) iv. পালমোনারি (মিশ্র)	মিশ্র স্নায়ু	স্বরযন্ত্র, হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী ও ফুসফুস	স্বরযন্ত্র, হৃৎপিণ্ড পাকস্থলী ও ফুসফুসের কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করে।
XI. স্পাইনাল অ্যাকসেসরি (Spinal accessory)	মেডুলা অবলংগাটার পার্শ্বদেশ	চেষ্টীয় স্নায়ু	গলবিল, স্বরযন্ত্র, গ্রীবা ও কাঁধ	মাথা (গ্রীবা) ও কাঁধের সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করে।
XII. হাইপোগ্লোসাল (Hypoglossal)	মেডুলা অবলংগাটার অঙ্কীয়দেশ	চেষ্টীয় স্নায়ু	জিহ্বা	জিহ্বার সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করে।

[মানুষের ১২ জোড়া করোটিক স্নায়ুর নাম ধারাবাহিকভাবে সহজে মনে রাখার জন্য- **"ওরে ও অকু তুরা তুরি আয় ফটিক আজ গাইছে ভাল আ হা"** (OOO-TTA-FAG-VAH): ওরে (O) = অলফ্যাক্টরি; ও (O) = অপটিক; অকু (O) = অকুলোমোটর; **তুরা** (T) = ট্রকলিয়ার; **তুরি** (T) = ট্রাইজেমিনাল ; **আয়** (A) = অ্যাবডুসেন্স; **ফটিক** (F) = ফেসিয়াল; **আজ** (A) = অডিটরি; **গাইছে** (G) = গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল; **ভাল** (V) = ভেগাস; **আ** (A) = স্পাইনাল অ্যাকসেসরি; **হা** (H) = হাইপোগ্লোসাল।]

সুষুম্নাস্নায়ু (Spinal nerve)

যেসব স্নায়ু সুষুম্নাকাণ্ড থেকে সৃষ্ট, মিশ্র প্রকৃতির এবং সুষুম্নাকাণ্ডের মাধ্যমে প্রতিবর্তী ক্রিয়া সৃষ্টি করে তাদের **সুষুম্নাস্নায়ু** বা **স্পাইনাল নার্ভ** (spinal nerve) বলে। **সুষুম্নাস্নায়ু ৩১ জোড়া**। প্রতিটি স্নায়ু সুষম্নাকাণ্ডের সাথে **একটি ডর্সাল সেনসরি রুট** (dorsal sensory root) এবং একটি **ভেন্ট্রাল মটর রুট** (ventral motor root) দ্বারা যুক্ত থাকে। প্রতিটি সুষুম্নাস্নায়ু প্রান্তের দিকে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন পেশিতে প্রবেশ করে। এদের নাম, অবস্থান ও সংখ্যা ছকে উপস্থাপন করা হলো–

স্নায়ুর নাম	অবস্থান	সংখ্যা
গ্রীবাদেশীয় (Cervical)	গ্রীবাদেশ	৮ জোড়া
বক্ষদেশীয় (Thoracic)	বক্ষদেশ	১২ জোড়া
কটিদেশীয় (Lumber)	কটিদেশ	৫ জোড়া
শ্রোণিদেশীয় (Sacral)	শ্রোণিদেশ	৫ জোড়া
পুচ্ছদেশীয় (Coccygeal)	পুচ্ছদেশ	১ জোড়া

চিত্র ৮.১১ : সুষুম্নাস্নায়ু

মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	মস্তিষ্ক	সুষুম্নাকাণ্ড
১। অবস্থান	এটি করোটিকার মধ্যে অবস্থান করে।	এটি মেরুদণ্ডের মধ্যে অবস্থান করে।
২। আকৃতি	এটি স্ফীত ও ডিম্বাকৃতির।	এটি লম্বা ও প্রায় চোঙাকৃতির।
৩। বিভক্তি	এটি বাইরের দিক থেকে সালকি ও জাইরি ফিশার দ্বারা বিভক্ত থাকে।	এটি বাইরের দিক থেকে অ্যান্টেরিয়র ও পস্টেরিয়র ফিশার দ্বারা বিভক্ত থাকে।
৪। স্নায়ুর সংখ্যা	মস্তিষ্ক থেকে ১২ জোড়া স্নায়ু সৃষ্টি হয়।	সুষুম্নাকাণ্ড থেকে ৩১ জোড়া স্নায়ু সৃষ্টি হয়।
৫। কাজ	দেহের সকল যান্ত্রিক, জৈব রাসায়নিক ও শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে।	সুষুম্না স্নায়ু ও মস্তিষ্কের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে এবং প্রতিবর্ত ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে।

করোটিক স্নায়ু ও সুষুম্নাস্নায়ুর মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	করোটিক স্নায়ু	সুষুম্নাস্নায়ু
১। উৎপত্তিস্থল	মস্তিষ্ক থেকে উৎপন্ন হয়।	সুষুম্নাকাণ্ড থেকে উৎপন্ন হয়।
২। সংখ্যা	১২ জোড়া।	৩১ জোড়া।
৩। স্নায়ুমূল	প্রতিটি স্নায়ুর ১টি স্নায়ুমূল থাকে।	প্রতিটি স্নায়ুর ১ জোড়া স্নায়ুমূল আছে।
৪। স্নায়ু প্রকৃতি	স্নায়ু সংবেদী অথবা চেষ্টীয় অথবা মিশ্র প্রকৃতির হয়।	সকল স্নায়ু মিশ্র প্রকৃতির।
৫। অবস্থা	করোটিক স্নায়ু সুষুম্নাস্নায়ু অপেক্ষা অধিকতর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং উন্নততর।	করোটিক স্নায়ুর মতো উন্নত নয়। ফলে মস্তিষ্কে উদ্দীপনা পৌছাতে পারে না। সুষুম্নাকাণ্ডের মাধ্যমে প্রতিবর্তী ক্রিয়া সৃষ্টি করে।

☐ **কাজ** : (i) করোটিক স্নায়ুগুলোর উৎপত্তি ও প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর। (ii) সংবেদী অঙ্গগুলোর সাথে সম্পর্কিত স্নায়ুগুলো কার্যকারিতা হারালে উপযুক্ত প্রতিবেদন অসম্ভব– বিশ্লেষণ কর।

৮.৪ মানব সংবেদী অঙ্গ (Human Sensory Organs)

জীব বিবর্তনের ফলে যখন এককোষী জীব থেকে বহুকোষী জীবের উদ্ভব ঘটে তখন বহুকোষী জীবের কোষগুলোর মধ্যে যোগাযোগের প্রয়োজনে প্রাণিদেহে দুই প্রকার যোগাযোগ নিয়ন্ত্রণকারী তন্ত্রের উদ্ভব ঘটে। প্রথমটি হলো স্নায়ুতন্ত্র এবং দ্বিতীয়টি হলো সংবেদী অঙ্গ। **যেসব গ্রাহক অঙ্গের মাধ্যমে পরিবেশ থেকে আগত বিশেষ উদ্দীপনা** (চাপ, তাপ, স্পর্শ, দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ ও স্বাদ ইত্যাদি) **গৃহীত হয়ে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে প্রেরিত হয় তাকে সংবেদী অঙ্গ বা জ্ঞানেন্দ্রিয় বলে।** মানবদেহে প্রায় ১১ ধরনের সংবেদী গ্রাহক বিদ্যমান। মানবদেহের প্রধান সংবেদী অঙ্গগুলো হলো **চক্ষু বা চোখ** (eye), **কর্ণ** (ear), **নাসিকা** (nose), **জিহ্বা** (tongue) ও **ত্বক** (skin)। এ পাঁচটি প্রধান জ্ঞানেন্দ্রিয়কে একত্রে **পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ও** বলা হয়। এগুলো দর্শন (vision), শ্রবণ ও ভারসাম্য (hearing and equilibrium), ঘ্রাণ (smell), স্বাদ (taste) এবং স্পর্শ (touch) রক্ষাকারী অঙ্গ হিসেবে পরিচিত।

চোখ : আলোক সংবেদী ও দর্শনেন্দ্রিয় (EYES : Photoreceptor and Vision organs)

চোখের সাহায্যে আমরা বহির্জগতের রূপ অনুভব করি, তাই চোখকে **দর্শনেন্দ্রিয়** (organ of vision) বলে।

অবস্থান : মানুষের চোখ দুটি নাসিকার দু'পাশে করোটির অক্ষিকোটরে অবস্থিত। চোখের মাত্র $\frac{১}{৬}$অংশ বাইরের থেকে দেখা যায় এবং বাকি $\frac{৫}{৬}$অংশ কোটরের ভেতরে অবস্থান করে।

চোখের গঠন : মানুষের চোখের বিভিন্ন অংশকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়, যথা– **অক্ষিগোলক বা নেত্রগোলক** (eye ball) ও **আনুষঙ্গিক অংশ** (accessory parts)। মানুষের চোখের বিভিন্ন অংশ সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

CamScanner

মানুষের চোখের বিভিন্ন অংশের ছক

- চোখ
  - অক্ষিগোলক বা নেত্রগোলক
    - অক্ষিগোলকের প্রাচীর
      - স্ক্লেরা
        - ১. কর্নিয়া
        - ২. ল্যামিনা ক্রাইব্রোসা
      - কোরয়েড
        - ১. আইরিশ
        - ২. পিউপিল
        - ৩. সিলিয়ারি বডি
        - ৪. সাসপেন্সরি লিগামেন্ট
      - রেটিনা
        - ১. রড কোষ
        - ২. কোন কোষ
    - লেন্স
    - প্রকোষ্ঠ
      - i. অগ্র প্রকোষ্ঠ
      - ii. পশ্চাৎ প্রকোষ্ঠ
      - iii. ভিট্রিয়াস প্রকোষ্ঠ
  - আনুষঙ্গিক অংশ
    - i. অক্ষিকোটর
    - ii. অক্ষিপল্লব বা চক্ষুপত্র
    - iii. অক্ষিপক্ষ
    - iv. আই ব্রো
    - v. চক্ষুপেশি
    - vi. কনজাংক্টিভা
    - vii. অক্ষিগ্রন্থি

(ক) অক্ষিগোলক বা নেত্রগোলক (Eye ball)

অক্ষিগোলক চোখের প্রধান অংশ। এটি একটি ক্ষুদ্র ক্যামেরার মতো। এটি অক্ষিকোটরের মধ্যে ছয়টি অক্ষিপেশি দ্বারা ঝুলে থাকে। অক্ষিগোলক তরল পদার্থ পূর্ণ গোলাকার অংশবিশেষ। এর ব্যাস ২৩-২৫ মিলিমিটার। এটি তিনটি প্রধান অংশ নিয়ে গঠিত, যথা– ১। **অক্ষিগোলকের প্রাচীর**, ২। **লেন্স** ও ৩। **প্রকোষ্ঠ**।

১। অক্ষিগোলকের প্রাচীর (Wall of Eye ball) : অক্ষিগোলকের প্রাচীর তিনটি স্তর দ্বারা আবৃত। যথা : **(ক) স্ক্লেরা, (খ) কোরয়েড ও (গ) রেটিনা।**

(ক) স্ক্লেরা (Sclera) : এটি অক্ষিগোলকের সর্বাপেক্ষা বাইরের স্তর। স্তরটি সাদা, পুরু ও দৃঢ়, অস্বচ্ছ, স্থিতিস্থাপক, তন্তুময় যোজক কলা এবং তরুণাস্থি নির্মিত।

স্ক্লেরার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্য অংশগুলো হলো–

১। কর্নিয়া (Cornea) : স্ক্লেরার সম্মুখভাগে উৎগত, উন্মুক্ত, স্বচ্ছ ও সামান্য উত্তলাকার অংশকে কর্নিয়া বলে। কর্নিয়াকে **চোখের জানালা** (window of eye) বলা হয় কারণ এর মধ্য দিয়ে চোখে আলোকরশ্মি প্রবেশ করে।

কাজ : প্রতিসারক মাধ্যমরূপে কাজ করে। অক্ষিগোলকের মধ্যে আলো প্রবেশে সাহায্য করে।

২। ল্যামিনা ক্রাইব্রোসা (Lamina cribrosa) : চোখের পশ্চাৎ দিকে স্ক্লেরার যে বিন্দু দিয়ে অপটিক স্নায়ু প্রবেশ করে সে অংশকে ল্যামিনা ক্রাইব্রোসা বলে।

কাজ : এটি চোখ ও চোখের চারপাশের টিস্যুর মধ্যে বিভিন্ন উপাদানের চাপ নিয়ন্ত্রণ করে।

স্ক্লেরার কাজ : এটি অক্ষিগোলকের আকার নিয়ন্ত্রণ করে, বহিঃআঘাত থেকে ভেতরের অংশসমূহকে ও জীবাণুর আক্রমণ হতে রক্ষা করে এবং চক্ষুপেশিসমূহ সংযুক্ত রাখে। অক্ষিগোলকের মধ্যে আলো প্রবেশে বাধা দান করে।

(খ) কোরয়েড (Choroid) : এটি স্ক্লেরা ও রেটিনার মধ্যবর্তী স্তর। এটি স্নায়ু ও কৈশিক জালিকাসমৃদ্ধ, যোজক কলা ও রঞ্জক কোষ (মেলানিন) সমন্বয়ে গঠিত। এটি কালো বর্ণের। এই স্তরটি আলো অপ্রবেশ্য।

কোরয়েডের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশ–

১। আইরিশ (Iris) : কর্নিয়ার সংযোগস্থল বরাবর কোরয়েড স্ক্লেরা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কর্নিয়ার পেছনে একটি অস্বচ্ছ, রঙিন, বৃত্তাকার সংকোচনশীল ডিস্ক গঠন করে, একে আইরিশ বলে। আইরিশের কেন্দ্রে পিউপিল (Pupil) নামক একটি ছিদ্র থাকে।

কাজ : পিউপিলকে সংকুচিত-প্রসারিত করে চোখের রেটিনায় আলো প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করে।

CamScanner

২। পিউপিল (Pupil) : এটি আইরিশের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত একটি গোলাকার ছিদ্র (ব্যাস ১-৮ মিলিমিটার)। একে ঘিরে বৃত্তাকার ও অরীয় পেশি অবস্থিত। আলোকের তীব্রতা অনুযায়ী এ পেশিগুলোর সংকোচন-প্রসারণের ফলে পিউপিল ছোট (এ সময় অরীয় পেশি প্রসারিত হয় এবং বৃত্তাকার পেশি সংকুচিত হয়) ও বড় (এ সময় অরীয় পেশি সংকুচিত হয় এবং বৃত্তাকার পেশি প্রসারিত হয়) হয়।

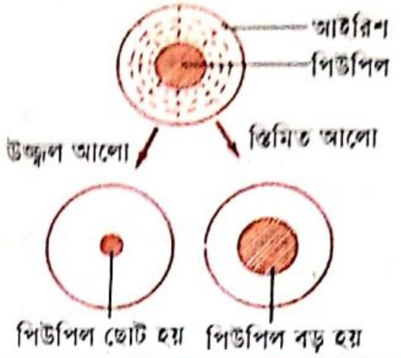

চিত্র ৮.১২.২ : আইরিশের মাধ্যমে পিউপিল নিয়ন্ত্রণ

কাজ : পিউপিল অক্ষিগোলকে আলোক প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করে এবং এর মধ্য দিয়ে আলো লেন্সে এসে পড়ে। মৃদু আলোতে পিউপিল বড় হয় এবং উজ্জ্বল বা তীব্র আলোতে পিউপিল ছোট হয়।

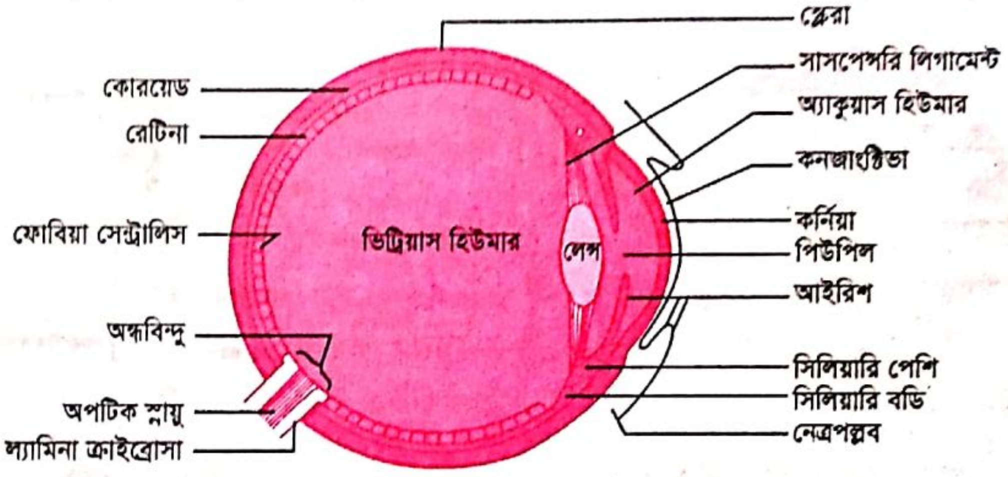

চিত্র ৮.১২.১ : মানুষের চোখের লম্বচ্ছেদের চিহ্নিত চিত্র

৩। **সিলিয়ারি বডি** (Ciliary body) : আইরিশের পেছনে কোরয়েডের অপর একটি অংশ গোলাকার ও স্ফীত হয়ে সিলিয়ারি বডি বা সিলীয় অঙ্গ গঠন করে। এটি **সিলিয়ারি বলয়** (ciliary ring), **সিলিয়ারি প্রবর্ধক** (ciliary process) ও **সিলিয়ারি পেশি** (ciliary muscle) নিয়ে গঠিত। চোখের লেন্স সাসপেন্সরী লিগামেন্ট (Suspensory ligament) দিয়ে সিলিয়ারী বডির সাথে যুক্ত, সিলীয় পেশিগুলো লেন্সের আকৃতি পরিবর্তন করে উপযোজন ক্রিয়ায় অংশ নেয়।

কাজ : এটি লেন্সকে ঝুলিয়ে রাখা ছাড়াও লেন্সের বক্রতার ব্যাসার্ধের পরিবর্তনের মাধ্যমে সঠিক প্রতিবিম্ব গঠনে সহায়তা করে। সিলিয়ারি পেশিগুলো লেন্সের আকৃতি পরিবর্তন করে উপযোজনে অংশ নেয়। সিলিয়ারি বডি অ্যাকুয়াস হিউমারও উৎপন্ন করে।

৪। **সাসপেন্সরি লিগামেন্ট** (Suspensory ligament) : লেন্সের চতুর্দিক বেষ্টনকারী লিগামেন্টকে সাসপেন্সরি লিগামেন্ট বলে। লিগামেন্টের অপর প্রান্ত সিলিয়ারি বডির সাথে যুক্ত থাকে।

কাজ : সাসপেন্সরি লিগামেন্ট দিয়ে লেন্সটি যথাস্থানে অবস্থান করে এবং সিলিয়ারি বডির সাথে সংযুক্ত থাকে।

কোরয়েডের কাজ : অক্ষিগোলকের বিভিন্ন অংশে (বিশেষ করে স্ক্লেরা ও রেটিনায়) পুষ্টিদ্রব্য ও অক্সিজেন সরবরাহ করে এবং বর্জ্য অপসারণ করে।

(গ) রেটিনা (Retina) : অক্ষিগোলকের সবচেয়ে ভেতরের **আলোক সংবেদী** কোষস্তরকে রেটিনা বা অক্ষিপট বলে। রেটিনা ১০টি উপস্তর নিয়ে গঠিত। রেটিনায় দু'ধরনের স্নায়ুকোষ বা আলোক সংবেদী কোষ নিয়ে গঠিত উপস্তরটিই প্রধান। আলোক সংবেদী কোষ দুটি হলো–

১। **রড কোষ** (Rod cell) : এরা দণ্ডাকার এবং মৃদু আলোর প্রতি সংবেদনশীল। মানুষের চোখের রেটিনায় ১২ কোটি থেকে ১২ কোটি ৫০ লক্ষ রড কোষ থাকে। রড কোষে রোডোপসিন (rhodopsin) নামক প্রোটিন এবং ভিটামিন A থাকে। ভিটামিন A এর অভাবে রড কোষ নষ্ট হয়ে যায়, তাই রাতকানা (night blindness) রোগ দেখা দেয়। এ কোষগুলো মৃদু বা অনুজ্জ্বল আলোতে (dim light) দর্শনে সহায়তা করে।

২। কোন কোষ (Cone cell) : এরা মোচাকার বা কোনাকৃতি এবং উজ্জ্বল বা তীব্র ও রঙিন আলোর প্রতি সংবেদনশীল। মানুষের চোখের রেটিনায় ৬০-৭০ লক্ষ কোন কোষ থাকে। কোন কোষে আইডোপসিন (iodopsin) নামক নীল রঞ্জক এবং সায়ানোপসিন (cyanopsin) নামক বেগুনি রঞ্জক থাকে। এরা বর্ণ শোষণে এবং ছবির সঠিক বিশ্লেষণে সক্ষম। মানুষের রেটিনাতে তিন ধরনের কোন কোষ থাকে যারা ভিন্ন ধরনের আলোর বর্ণ বা তরঙ্গদৈর্ঘ্যের প্রতি সংবেদনশীল। প্রথম ধরনের কোন কোষ লাল বা হলুদ বর্ণ (দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্য), দ্বিতীয় ধরন সবুজ বর্ণ (মধ্যম তরঙ্গদৈর্ঘ্য) এবং তৃতীয় ধরন নীল বর্ণ (ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্য) অনুধাবন করে। এ কোষগুলো সমভাবে উদ্দীপ্ত হলে সাদা বর্ণ দৃষ্ট হয়।

উভয় কোষের সাইটোপ্লাজমে প্রচুর পরিমাণে মাইটোকন্ড্রিয়া ও অন্যান্য কোষীয় অঙ্গাণু থাকে। কোষগুলোর প্রান্তীয় সাইন্যাপটিক্যাল অংশ স্ফীত হয়ে বাল্ব গঠন করে যা দ্বিমেরু নিউরনের সাথে সিন্যাপস গঠন করে।

রেটিনার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশগুলো হলো–

(i) অন্ধবিন্দু (Blind spot) : রেটিনার যে স্থানে অপটিক স্নায়ু প্রবেশ করে সেখানে রড বা কোন কোষ থাকে না। ফলে ওই স্থানে কোনো বস্তুর প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয় না, একে অন্ধবিন্দু বলা হয়।

(ii) পীতবিন্দু (Yellow spot) : অন্ধবিন্দুর সন্নিকটে রেটিনার সবচেয়ে তীক্ষ্ণ অনুভূতিসম্পন্ন টোল খাওয়ানো সংক্ষিপ্ত অঞ্চলটিকে পীতবিন্দু বা ফোভিয়া সেন্ট্রালিস (fovea centralis) বলে। এতে কেবল কোন কোষ থাকে, রড কোষ থাকে না। এটি অতিরিক্ত আলো সংবেদী, তাই এখানে সবচেয়ে ভালো ও স্পষ্ট প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়।

(iii) অপটিক স্নায়ু (Optic nerve) : এটি দ্বিতীয় করোটিক স্নায়ু যা অক্ষিগোলকের অন্ধবিন্দু দিয়ে রেটিনায় বিস্তার লাভ করে। এটি দর্শনীয় বস্তুর অনুভূতি মস্তিষ্কে প্রেরণ করে।

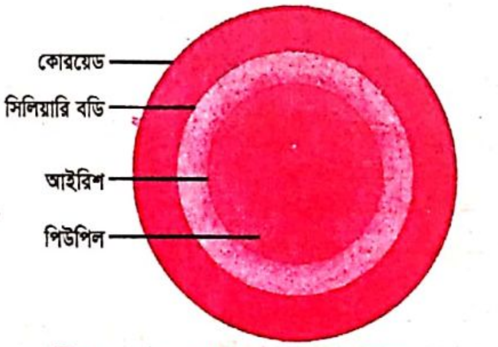

চিত্র ৮.১৩ : চোখের সামনের অংশ

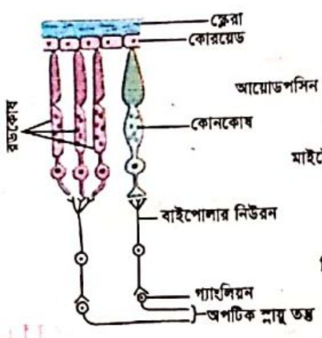

চিত্র ৮.১৪ (ক) : রেটিনার গঠন

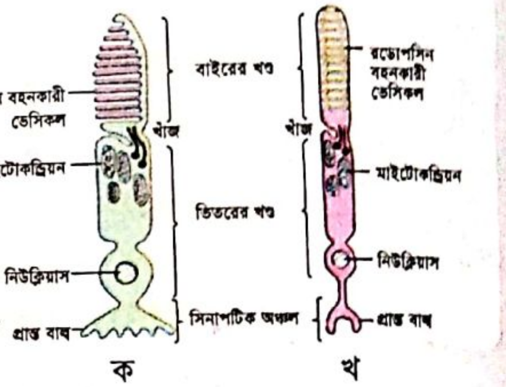

চিত্র ৮.১৪ (খ) : (ক) কোন কোষ ও (খ) রড কোষ

রেটিনার কাজ : এখানে বস্তুর প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়। এর কোন কোষগুলো উজ্জ্বল আলোতে এবং রড কোষগুলো মৃদু আলোতে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে। পীতবিন্দু বা ফোবিয়া সেন্ট্রালিসে দর্শনীয় বস্তুর সুস্পষ্ট প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়। এটি বিভিন্ন ধরনের প্রতিবর্তী ক্রিয়ায় সহায়তা করে।

২। লেন্স (Lens) : পিউপিলের পেছনে একটি স্বচ্ছ, স্থিতিস্থাপক ও দ্বিউত্তল লেন্স সিলিয়ারি বডির সাথে সাসপেন্সরি লিগামেন্টযুক্ত হয়ে ঝুলে থাকা অংশকে লেন্স বলে। লেন্সে রক্ত সরবরাহ নেই। সিলীয় পেশির সংকোচন-প্রসারণে লেন্সও সংকুচিত-প্রসারিত হয়। লেন্সটি একটি ক্যাপসুল পরিবেষ্টিত থাকে। লেন্সটির ব্যাস ১১ মিলিমিটার এবং মাঝখানের স্থুলত্ব প্রায় ৩.৬-৩.৯ মিলিমিটার।

কাজ : লেন্সের মাধ্যমে বস্তু থেকে আগত আলোকরশ্মি রেটিনার নির্দিষ্ট অংশে প্রতিফলিত হয়।

৩। প্রকোষ্ঠ বা গহ্বর (Chamber) : অক্ষিগোলকে তিনটি গহ্বর বা প্রকোষ্ঠ থাকে। যথা :

(i) অগ্র প্রকোষ্ঠ (Anterior chamber): আইরিশ ও কর্নিয়ার মাঝে অবস্থিত মাঝারি আকৃতির প্রকোষ্ঠ। এ প্রকোষ্ঠটি অ্যাকুয়াস হিউমার (aquous humour) নামক তরল পদার্থ দ্বারা পূর্ণ থাকে।

(ii) পশ্চাৎ প্রকোষ্ঠ (Posterior chamber) : আইরিশ ও লেন্সের মাঝে অবস্থিত ক্ষুদ্রাকৃতির প্রকোষ্ঠ। এ প্রকোষ্ঠটিও অ্যাকুয়াস হিউমার তরল পদার্থ দ্বারা পূর্ণ থাকে। অ্যাকুয়াস হিউমারের প্রকৃতি অনেকটা সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইডের মতো।

(iii) ভিট্রিয়াস প্রকোষ্ঠ (Vitreous chamber): এটি লেন্স ও রেটিনার মধ্যবর্তী গোলাকৃতির বৃহৎ প্রকোষ্ঠ। এটি চোখের প্রায় চার-পঞ্চমাংশ গঠন করে। এটি ভিট্রিয়াস হিউমার (vitreous humour) নামক জেলির মতো তরল পদার্থ দ্বারা পূর্ণ থাকে। ভিট্রিয়াস হিউমারে ৯৯% পানি এবং ১% কোলাজেন ও হায়ালোরোনিক এসিড (hyaluronic acid) থাকে। ভিট্রিয়াস প্রকোষ্ঠ থেকে রেটিনার উপরে একটি সূক্ষ্ম ও রঙিন এপিথেলিয়াম স্তর সৃষ্টি হয়।

অক্ষিপ্রকোষ্ঠের কাজ : অক্ষিগোলকের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে বিদ্যমান তরল চোখের সঠিক আকৃতি বজায় রাখে। চোখের অন্তঃচাপ ও বহিঃচাপ নিয়ন্ত্রণ করে। আলোকরশ্মি প্রতিসরণ করে এবং রেটিনা ও লেন্সে পুষ্টি যোগায়।

(খ) আনুষঙ্গিক অংশ (Accessory parts)

১। অক্ষিকোটর (Orbit) : মানুষের করোটির সম্মুখে নাসিকার দু-পাশে অস্থিনির্মিত গহ্বর দুটিকে **অক্ষিকোটর** বলে।
কাজ : এখানে অক্ষিগোলক সুরক্ষিত থাকে।

২। অক্ষিপল্লব বা নেত্রপল্লব বা চোখের পাতা (Eyelids) : মানুষের প্রতিটি চোখের ওপরে ও নিচে একটি করে মোট দুটি পেশিময়, পাতার ন্যায় পাতলা পর্দা থাকে, এগুলো যথাক্রমে ঊর্ধ্ব অক্ষিপল্লব এবং একটি নিম্ন অক্ষিপল্লব নামে পরিচিত। এছাড়াও মানুষের চোখের কোণে (নাসিকার দিকে) তৃতীয় অক্ষিপল্লব বা **উপ-অক্ষিপল্লব** বা **নিকটিটেটিং পর্দা** (nictitating membrane), ক্ষয়প্রাপ্ত (vestigeal) অবস্থায় নিষ্ক্রিয় অঙ্গ ও ক্ষুদ্র লালচে মাংসপিণ্ডরূপে অবস্থান করে। অক্ষিপল্লব দুটি সঞ্চারণশীল হওয়ায় অশ্রুগ্রন্থি থেকে ক্ষরিত অশ্রু (tear) অক্ষিগোলকের বহির্ভাগে ছড়িয়ে পড়ে। এ কারণে অক্ষিগোলক শুকিয়ে যায় না।

কাজ : অক্ষিপল্লব চোখকে ঢেকে রাখে এবং ধূলিকণা, পানি, ঘাম, তীব্র আলো, বাতাস প্রভৃতি থেকে চোখকে রক্ষা করে।

৩। অক্ষিপক্ষ (Eyelash) : মানুষের ঊর্ধ্ব ও নিম্ন অক্ষিপল্লবের মুক্তপ্রান্তে একসারি লোম সাজানো থাকে, এগুলোকেই **অক্ষিপক্ষ** বা **পল্লব রোম** বলে।

কাজ : এরা ধূলাবালিকে চোখে প্রবেশে বাধা দেয় এবং তীব্র আলো থেকেও চোখকে রক্ষা করে।

৪। আই ব্রো (Eye-brows) : প্রতিটি চোখের কিছুটা ওপরের দিকে ও কপালের নিচের দিকে ঘনসন্নিবিশিষ্ট লোমযুক্ত ও বাঁকা ধনুকের মতো অঞ্চলকে **আই ব্রো** বলে।

কাজ : বৃষ্টির পানি ও ঘামকে কপাল থেকে গড়িয়ে চোখে আসতে বাধা দেয়।

চিত্র ৮.১৫ : অক্ষিপেশিসহ অক্ষিগোলক ও মানুষের চোখে অশ্রুগ্রন্থির অবস্থান

৫। অক্ষিপেশি (Eye muscles) : প্রতিটি অক্ষিগোলক ৬টি করে অক্ষিপেশির সাহায্যে অক্ষিকোটরের মধ্যে অবস্থান করে। এদের মধ্যে ৪টি **রেক্টাস** (rectus) পেশি এবং ২টি **অবলিক** (oblique) পেশি। প্রতিটি চোখে নিম্নলিখিত ৬টি পেশি থাকে। যথা–

- **মেডিয়াল রেক্টাস** (Medial rectus) : অক্ষিগোলককে অক্ষিকোটরের ভেতরের দিকে ঘুরতে সহায়তা করে।
- **ল্যাটারাল রেক্টাস** (Lateral rectus) : অক্ষিগোলককে অক্ষিকোটরের বাইরের দিকে ঘুরতে সহায়তা করে।
- **সুপিরিয়র রেক্টাস** (Superior rectus) : অক্ষিগোলককে চক্ষুকোটরের উপরের দিকে ঘুরতে সহায়তা করে।
- **ইনফিরিয়র রেক্টাস** (Inferior rectus) : অক্ষিগোলককে চক্ষুকোটরের নিচের দিকে ঘুরতে সহায়তা করে।
- **সুপিরিয়র অবলিক** (Superior oblique) : অক্ষিগোলককে অপটিক স্নায়ু কর্নিয়ার মধ্য অক্ষ বরাবর ঘুরতে সহায়তা করে।
- **ইনফিরিয়র অবলিক** (Inferior oblique) : অক্ষিগোলককে অবলিক পেশির বিপরীত দিকে ঘুরতে সহায়তা করে।

কাজ : উল্লিখিত ৬টি পেশির সাহায্যে চোখ অক্ষিকোটরে আটকানো থাকে এবং অক্ষিগোলকের সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করে।

৬। কনজাংক্টিভা (Conjunctiva) : অক্ষিগোলকের কর্নিয়া একটি স্বচ্ছ পাতলা পর্দাবৃত থাকে, একে কনজাংক্টিভা বলে। কনজাংক্টিভার প্রদাহকে **কনজাংক্টিভাইটিস** (conjunctivitis) বলে।

কাজ : কর্নিয়াকে বাইরের আঘাত, ধুলাবালি ও জীবাণু থেকে রক্ষা করে এবং পরিষ্কার ও ভেজা রাখে।

৭। অক্ষিগ্রন্থি (Eye gland) : প্রত্যেক চোখে তিন ধরনের গ্রন্থি থাকে। যথা–

- **অশ্রুগ্রন্থি বা ল্যাকরিমাল গ্রন্থি** (Lacrimal gland): প্রতিটি অক্ষিগোলকের ওপরের ও সামনে অবস্থিত।
- **হার্ডেরিয়ান গ্রন্থি** (Harderian gland): অক্ষিগোলকের পশ্চাতে অঙ্কীয় দিকে অবস্থিত।
- **মেবোমিয়ান গ্রন্থি** (Meibomian gland): অক্ষিপল্লবের কোনায় অবস্থিত।

কাজ : হার্ডেরিয়ান ও মেবোমিয়ান গ্রন্থি তৈলাক্ত ক্ষরণ করে অক্ষিপল্লব ও কর্নিয়াকে পিচ্ছিল রাখে। অশ্রুগ্রন্থির অশ্রু চোখকে ভেজা রাখতে এবং চোখে উৎপন্ন ময়লা বের করে অক্ষিগোলককে পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে। এছাড়া অশ্রুতে অবস্থিত এনজাইম **লাইসোজাইম** (lysozyme) ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে চোখকে সুরক্ষা প্রদান করে। অশ্রু এক প্রকারের সোডিয়াম ক্লোরাইড ও সোডিয়াম বাই-কার্বনেট নিয়ে গঠিত জলীয় দ্রবণ। অশ্রু চোখের উপরিতলের ধুলোবালি ধুয়ে দেয়।

CamScanner

রড কোষ ও কোন কোষের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	রড কোষ	কোন কোষ
১। আকৃতি	বাইরের খণ্ড রড আকৃতির।	বাইরের খণ্ড কোন আকৃতির।
২। দর্শনের তীক্ষ্ণতা	কম।	বেশি।
৩। রঞ্জক পদার্থ	রডপসিন নামক প্রোটিন।	আয়োডপসিন নামক প্রোটিন।
৪। সংযুক্তি	একটি বাইপোলার কোষের সঙ্গে অনেকগুলো রড কোষ সংযুক্ত থাকে।	একটি বাইপোলার কোষের সঙ্গে একটি মাত্র কোন কোষ সংযুক্ত থাকে।
৫। সংখ্যা	প্রতি রেটিনায় ১২ কোটি থেকে ১২ কোটি ৫০ লক্ষ।	প্রতি রেটিনায় ৬০-৭০ লক্ষ।
৬। বিতরণ	সমগ্র রেটিনায় সমভাবে উপস্থিত।	রেটিনার মধ্যস্থলে বিশেষ করে হলুদ বিন্দুতে সবচেয়ে বেশি।
৭। সংবেদনশীলতা	আলোর প্রতি অধিক সংবেদনশীল,তাই রাতের দর্শনে ব্যবহৃত হয়। একে **স্ক্যাটোপিক দর্শন** বলা হয়।	আলোর প্রতি কম সংবেদনশীল,তাই দিনের দর্শনে ব্যবহৃত হয়। একে **ফটোপিক দর্শন** বলা হয়।
৮। প্রতিবিম্ব	দর্শন বস্তুর সাদাকালো প্রতিবিম্ব তৈরি করে।	দর্শন বস্তুর রঙিন প্রতিবিম্ব তৈরি করে।
৯। রোগ	এটি ক্ষতিগ্রস্ত বা নষ্ট হলে রাতকানা রোগ হয়।	এটি ক্ষতিগ্রস্ত বা নষ্ট হলে বর্ণান্ধ রোগ হয়।

অন্ধবিন্দু ও পীতবিন্দুর মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	অন্ধবিন্দু	পীতবিন্দু
১। অবস্থান	রেটিনার পেছনে অপটিক স্নায়ুর প্রবেশ পথে।	অন্ধবিন্দুর সামান্য উপরে টোল খাওয়া হলদে অঞ্চল।
২। রড ও কোন কোষ	কোনো কোষ থাকে না।	শুধু কোন কোষ থাকে, রড কোষ থাকে না।
৩। আলো সংবেদন	আলোসংবেদী নয়।	অতিমাত্রায় আলোসংবেদী।
৪। প্রতিবিম্ব গঠন	রড কোষ ও কোন কোষ না থাকায় কোনো প্রতিবিম্ব গঠিত হয় না।	আলোকরশ্মি কেন্দ্রীভূত হওয়ায় বস্তুর প্রতিবিম্ব গঠিত হয়।
৫। স্নায়ুতন্ত্র	কোনো স্নায়ুতন্ত্র দেখা যায় না।	অসংখ্য স্নায়ুতন্ত্র থাকে।

প্রতিবিম্ব গঠন ও দর্শন প্রক্রিয়া (Formation of Image and Machanism of vision)

আমরা যে বস্তুকে দেখি তার থেকে প্রতিফলিত আলোকরশ্মি স্বচ্ছ কর্নিয়া ও অ্যাকুয়াস হিউমারকে ভেদ করে পিউপিল দিয়ে লেন্সের ওপর পড়ে। লেন্স থেকে আলো প্রতিসরিত হয়ে ভিট্রিয়াস হিউমারের মধ্য দিয়ে রেটিনায় পড়ে। রেটিনায় বস্তুর উল্টো প্রতিবিম্ব গঠিত হয়। এই সময় চোখটি ক্যামেরার মতো কাজ করে। রেটিনার রড ও কোন কোষ থেকে আলোক অনুভূতি অপটিক স্নায়ু মাধ্যমে সেরিব্রাম বা গুরুমস্তিষ্কের দর্শন কেন্দ্র বা ভিসুয়্যাল কর্টেক্সে (visual cortex) পৌছে। মস্তিষ্কের বিশেষ ক্ষমতা বলে রেটিনার উল্টো প্রতিবিম্বকে আমরা সোজাভাবে দেখি।

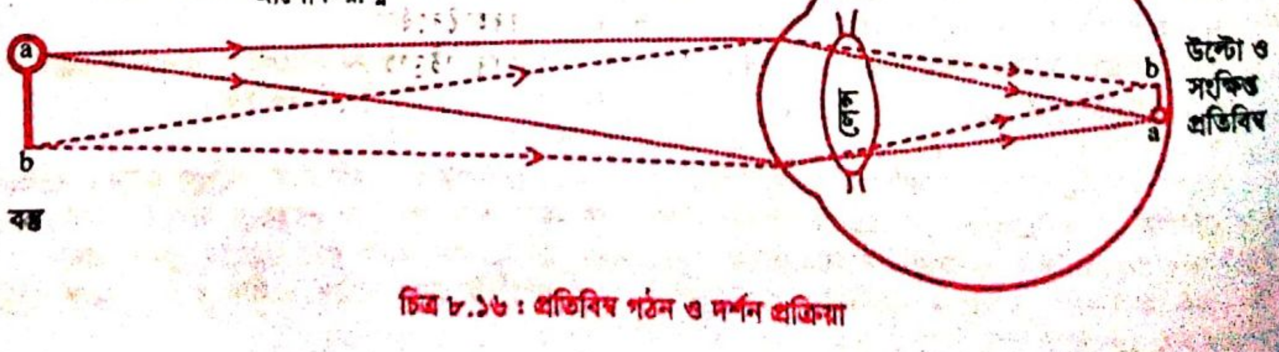

চিত্র ৮.১৬ : প্রতিবিম্ব গঠন ও দর্শন প্রক্রিয়া

CamScanner

দর্শন কৌশলের প্রবাহচিত্র :

আলোকরশ্মি → কর্নিয়া → অ্যাকুয়াস হিউমার →পিউপিল → লেন্স → ভিট্রিয়াস হিউমার → রেটিনা
↓
দর্শন (সোজা প্রতিবিম্ব গঠন) ← মস্তিষ্কের দর্শন কেন্দ্র ← অপটিকস স্নায়ু

উপযোজন (Accommodation)

স্থান পরিবর্তন না করে অক্ষিগোলকের পেশি ও লেন্সের সাহায্যে যে পদ্ধতিতে বিভিন্ন দূরত্বে অবস্থিত বস্তুকে স্পষ্টভাবে দেখা যায়, তাকে **উপযোজন** বা **অ্যাকোমোডেশন** বলে।

উপযোজন এক প্রকার প্রতিবর্ত প্রক্রিয়া। মানবচক্ষুর ভালো উপযোজন ক্ষমতা আছে। ২৫ সেমি দূর থেকে অসীম দূরত্ব পর্যন্ত কোনো বস্তু থেকে আগত আলোর দ্বারা চক্ষু প্রভাবিত হতে পারে। চোখের সিলিয়ারি বডি ও সাসপেন্সরি লিগামেন্টকে একত্রে **উপযোজন যন্ত্র** (accomodation apparatus) বলে। কাছে ও দূরের বস্তু দেখার জন্য স্তন্যপায়ীতে দু'ভাবে উপযোজন হয়। যথা–

(ক) খুব কাছে অবস্থিত বস্তুর প্রতিবিম্ব গঠন প্রক্রিয়া : কোনো দর্শনীয় বস্তু যখন চোখের খুব নিকটে অবস্থান করে, তখন চোখের বাইরে অপ্রকৃত প্রতিবিম্ব গঠিত হয় এবং অবস্থাকে এড়ানোর জন্য সিলিয়ারি পেশি প্রসারিত হয়। এর ফলে সাসপেন্সারি লিগামেন্ট প্রসারিত হয় এবং লেন্সের বক্রতা বৃদ্ধি পায়। এতে লেন্সটি মোটা ও খাটো হয় এবং লেন্সের ফোকাস দূরত্ব কমে যায়। ফোকাস দূরত্ব কমে যাওয়ার ফলে কাছের বস্তু থেকে আসা আলোকরশ্মি রেটিনায় পতিত হয়ে রেটিনায় প্রকৃত প্রতিবিম্ব গঠিত হয়।

চিত্র ৮.১৭ ক : খুব কাছে অবস্থিত বস্তুর প্রতিবিম্ব গঠন প্রক্রিয়া

চিত্র ৮.১৭ খ : দূরে অবস্থিত বস্তুর প্রতিবিম্ব গঠন প্রক্রিয়া

(খ) দূরে অবস্থিত বস্তুর প্রতিবিম্ব গঠন প্রক্রিয়া : দূরে অবস্থিত বস্তু কোনো থেকে আসা আলোকরশ্মি আমাদের চোখে অবস্থিত পিউপিলের মাধ্যমে প্রবেশ করলে সিলিয়ারি পেশি সংকুচিত হয়। ফলে সাসপেন্সারি লিগামেন্টও সংকুচিত হয় এবং লেন্সের বক্রতা কমে যায়। ফলে লেন্স সরু ও লম্বা হয়। এতে লেন্সের ফোকাস দূরত্ব বেড়ে যায়। ফোকাস দূরত্ব বেড়ে যাওয়ার ফলে দূরের বস্তু থেকে আগত আলোকরশ্মি রেটিনায় পতিত হয়ে প্রতিবিম্ব গঠিত হয়। এভাবে প্রয়োজনমতো লেন্সের বক্রতা কমিয়ে রেটিনার দৃষ্টি সংবেদী অঞ্চলে আলোকরশ্মি ফেলে মানুষের চোখে দূরের বস্তুর প্রতিবিম্ব গঠিত হয়।

এভাবে দর্শনীয় বস্তু ও লেন্সের মধ্যকার দূরত্বের পরিবর্তন সাধন না করেই সিলিয়ারি পেশি এবং সাসপেন্সারি লিগামেন্টের প্রসারণ বা সংকোচন ঘটিয়ে লেন্সের বক্রতার তথা ফোকাস দূরত্বের পরিবর্তন ঘটানোর মাধ্যমে মানবচক্ষুর উপযোজন ঘটে। সুস্থ ও স্বাভাবিক চোখের সহজাত উপযোজন ঘটে। মানুষের চল্লিশ বছর বয়স থেকে এ ক্ষমতা ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। এ অবস্থাকে চালশে বলে। এটা কোনো রোগ নয়। লেন্স বা চশমা ব্যবহার করার সাহায্যে এ সময় স্বাভাবিকভাবে রেটিনায় প্রতিবিম্ব গঠিত হয় এবং মানুষ প্রায় স্বাভাবিকভাবে দেখতে পায়।

মানুষের চোখের সীমাবদ্ধতা : (১) মানুষের চোখের আলোক গ্রহণ ক্ষমতা সীমিত কারণ এর আকৃতি সুনির্দিষ্ট। (২) এটি সুনির্দিষ্ট আলোক তীব্রতায় সাড়া দিয়ে কেবল দৃশ্যমান তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোকরশ্মি দেখতে সহায়তা করে। (৩) প্রতি মুহূর্তে চোখ বস্তুর নতুন প্রতিবিম্ব দেখে। (৪) আলোর তীব্রতা বাড়িয়ে এটি কোনো বস্তুর অস্পষ্ট প্রতিবিম্বকে স্পষ্ট করতে পারে না। (৫) চোখ কোনো বস্তুর প্রতিবিম্বকে ক্যামেরার মতো সংরক্ষণ করতে পারে না।

দ্বিনেত্র দৃষ্টি বা স্টেরিওস্কোপিক দৃষ্টি (Binocular or Sterioscopic vision)

যখন একসঙ্গে দুটি চোখ দিয়ে একই বস্তুর প্রতিবিম্ব দেখা যায় তখন সেই রকম দৃষ্টিকে **দ্বিনেত্র দৃষ্টি** বা **স্টেরিওস্কোপিক দৃষ্টি** বলে। যেমন– মানুষ, বানর, বাজপাখির ইত্যাদি প্রাণীদের দৃষ্টি। কোনো বস্তু থেকে প্রতিফলিত আলোকরশ্মি রেটিনায় পড়লে যে স্নায়ু উদ্দীপনা সৃষ্টি হয় তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে মস্তিষ্কের দৃষ্টিকেন্দ্রে (visual cortex) একটি মাত্র প্রতিবিম্বে একীভূত হয়, ফলে দু'চোখে একটি বস্তুকে এককভাবে দেখা যায়।

মানুষসহ কিছু প্রাণীর চোখ মাথার সামনের দিকে অবস্থিত। মানুষের এ চোখ দুটির মধ্যকার দূরত্ব ৬.৩ সেন্টিমিটার। ফলে কোনো বস্তু দেখার সময় প্রতিটি চোখ বস্তুটির একটি করে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে। এর ফলে দু'চোখে কোনো একটি বস্তুর দু'রকমের প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়। মস্তিষ্ক এ দু'রকমের প্রতিবিম্ব মিশিয়ে বস্তুর একটি ত্রিমাত্রিক প্রতিবিম্ব তৈরি করে থাকে। আর এ ধরনের প্রতিবিম্বই হলো দ্বিনেত্র দৃষ্টি বা বাইনোকুলার ভিশন।

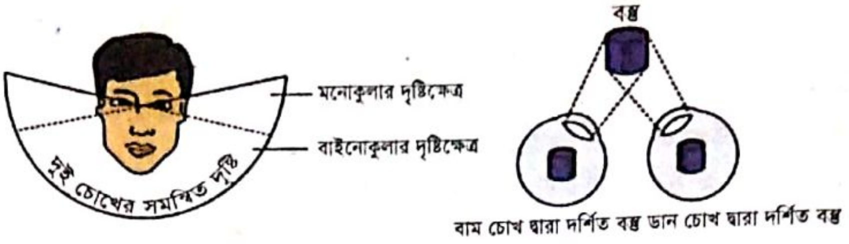

চিত্র ৮.১৮ : মানুষের দ্বিনেত্র দৃষ্টি

দ্বিনেত্র দৃষ্টির সুবিধা : (১) দ্বিনেত্র দৃষ্টি দ্বারা আমরা কোনো একটি বস্তুর আকৃতি ও গভীরতার সঠিক মূল্যায়ন করতে পারি। (২) কোনো একটি চোখে সমস্যা হলে অন্য চোখ দ্বারা আমরা দেখতে পারি। (৩) কোনো একটি বস্তুর দূরত্ব সঠিকভাবে অনুভব করা যায়। (৪) বস্তুর ত্রিমাত্রিক ছবি অবলোকন করা যায়।

❑ **কাজ :** (i) মানুষের চোখের লম্বচ্ছেদের চিত্র অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর। (ii) পিউপিলের সংকোচন প্রসারণে আইরিশের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। (iii) মানুষের চোখের সাথে ঘাসফড়িং এর পুঞ্জাক্ষির কার্যপদ্ধতি তুলনা কর। (iv) রেটিনা কীভাবে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে– বিশ্লেষণ কর।

[প্রাসঙ্গিক তথ্য : **একনেত্র দৃষ্টি** (Unicular vision) : যখন একসঙ্গে দুটি চোখ দিয়ে আলাদা বস্তুর প্রতিবিম্ব দেখা যায় তখন সেই রকম দৃষ্টিকে **একনেত্র দৃষ্টি** বলে। যেমন– ব্যাঙ, গরু ইত্যাদি প্রাণীদের দৃষ্টি।

মায়োপিয়া (Myopia): যে দৃষ্টিতে দূরের দৃষ্টি ব্যাহত হয় তাকে মায়োপিয়া বলে। অবতল লেন্সের চশমা ব্যবহারে এই রোগ সারে (একে -ve power বলে)।

হাইপারমেট্রোপিয়া (Hypermetropia) : যে দৃষ্টিতে কাছের দৃষ্টি ব্যাহত হয় তাকে হাইপারমেট্রোপিয়া বলে। উত্তল লেন্সের চশমা ব্যবহার করলে এই রোগ সারে (একে +ve power বলে)।

ছানি বা ক্যাটারাক্ট (Cataract): বয়সজনিত কারণে, লেন্স বা কর্নিয়া অস্বচ্ছ হলে দৃষ্টিশক্তি ক্রমশ চলে যায় বা ক্ষীণ হয়ে পড়ে। এ ত্রুটিকে ছানি বা ক্যাটারাক্ট বলে। লেন্স বা কর্নিয়া প্রতিস্থাপন করে এ ত্রুটি দূর করা যায়।

গ্লুকোমা (Glaucoma) : চোখের যেসব ত্রুটিপূর্ণ অবস্থায়, চোখ থেকে মস্তিষ্কে সংবেদ পরিবহনকারী অপটিক স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাদের একত্রে গ্লুকোমা বলে। এক্ষেত্রে সাধারণত অক্ষিগোলকের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠ-মধ্যস্থ তরলের (অ্যাকুয়াস হিউমার) চাপ অর্থাৎ ইন্ট্রা-আকিউলার চাপ (intraocular pressure-IOP) বৃদ্ধি পায়, যার ফলে অপটিক স্নায়ু বিনষ্ট হয়।]

কান : শ্রবণ ও ভারসাম্য রক্ষাকারী অঙ্গ (EAR : Hearing and Equilibrium Organ)

কান মানুষের **শ্রবণ** ইন্দ্রিয় এবং **ভারসাম্য** রক্ষাকারী অঙ্গ। মানুষের কানের সংখ্যা দুটি।

অবস্থান : মানুষের মস্তিষ্কের প্রতি পার্শ্বে চোখের পেছনে একটি করে কান অবস্থিত। কানের সূক্ষ্ম অঙ্গসমূহ মাথার করোটির **টেম্পোরাল** (temporal) হাড়ের ভেতরে শ্রুতিকোটরের মধ্যে সুরক্ষিত অবস্থায় থাকে।

গঠন : প্রতিটি কান ৩টি প্রধান অংশে বিভক্ত, যথা– (ক) **বহিঃকর্ণ** (external ear), (খ) **মধ্যকর্ণ** (middle ear) ও (গ) **অন্তঃকর্ণ** (internal ear)। কানের বিভিন্ন অংশের বিবরণ :

কানের বিভিন্ন অংশের ছক

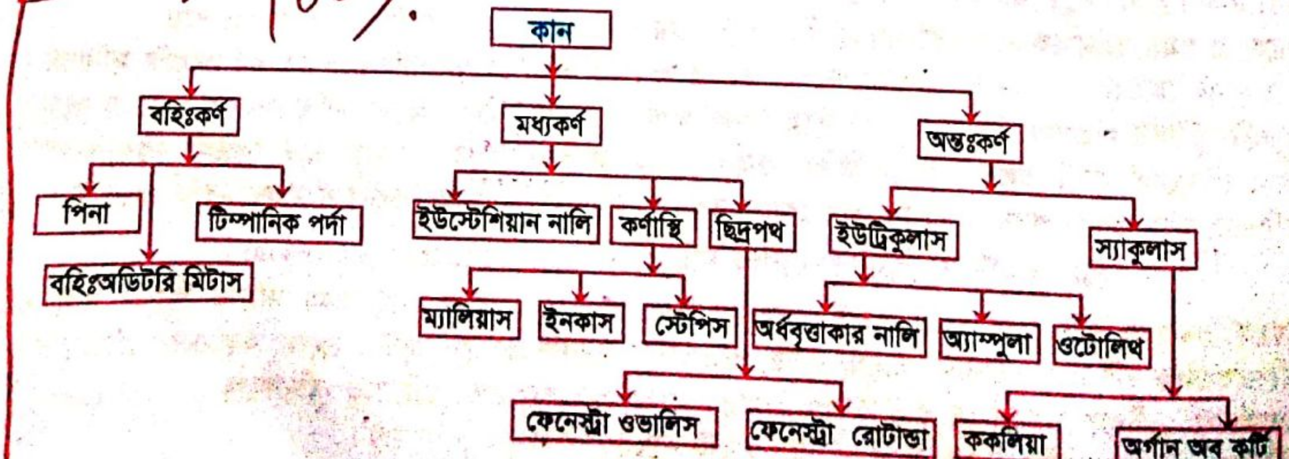

(ক) বহিঃকর্ণ (External ear)

এটি কানের প্রধান ও বাইরের অংশ। বহিঃকর্ণ আবার ৩টি অংশে বিভক্ত। যথা : ১. **কর্ণছত্র** বা **পিনা**, ২. **কর্ণকুহর** বা **বহিঃঅডিটরি মিটাস** ও ৩. **কর্ণপটহ** বা **টিম্পানিক পর্দা**।

১। কর্ণছত্র বা পিনা (Pinna) : মাথার দু'পাশে অবস্থিত চ্যাপ্টা ও নমনীয় অংশটির নাম পিনা। এটির ত্বক, পেশি ও কোমলাস্থি দ্বারা গঠিত। কর্মক্ষম পেশিতন্তু না থাকায় মানুষ কান নাড়াতে পারে না।

কাজ : পরিবেশ থেকে শব্দ তরঙ্গ সংগ্রহ করে অভ্যন্তরে প্রেরণ করে।

২। কর্ণকুহর বা বহিঃঅডিটরি মিটাস (External auditory meatus) : কর্ণছত্রের কেন্দ্রস্থল থেকে কর্ণপটহ পর্যন্ত বিস্তৃত একটি সরু নালিপথকে কর্ণকুহর বলে। এর বাইরের দুই-তৃতীয়াংশ তরুণাস্থি দিয়ে এবং এক-তৃতীয়াংশ অস্থিতে গঠিত। একটি ত্বক দ্বারা আবৃত এবং ত্বকে **মোমগ্রন্থি** ও **রোম কোষ** থাকে।

কাজ : কর্ণকুহরের মাধ্যমে শব্দ তরঙ্গ লম্বভাবে কর্ণপটহে পৌঁছে এবং এতে বিদ্যমান মোম ও রোম বাইরে থেকে আগত ধুলাবালি, জীবাণু ইত্যাদি আটকে দেয়। এটি টিম্পানিক পর্দার অনুকূল উষ্ণতা ও আর্দ্রতা বজায় রাখে।

৩। কর্ণপটহ বা টিম্পানিক পর্দা (Tympanic membrane) : কর্ণকুহরের শেষ প্রান্তে অবস্থিত পর্দাটিকে কর্ণপটহ বলে। এটি টানটান পাতলা, ডিম্বাকার ও স্থিতিস্থাপক পর্দা। এর বাইরের দিক অবতল এবং ভেতরের দিক উত্তল। এর সাথে মধ্যকর্ণের ম্যালিয়াস অস্থি যুক্ত থাকে।

কাজ : কর্ণকুহরের মাধ্যমে আগত শব্দতরঙ্গ দ্বারা কর্ণপটহ স্পন্দিত হয় এবং এই স্পন্দন অতঃপর মধ্যকর্ণে সঞ্চারিত হয়। বহিঃকর্ণকে মধ্যকর্ণ থেকে পৃথক রাখে।

(খ) মধ্যকর্ণ (Middle ear)

এটি বহিঃকর্ণ ও অন্তঃকর্ণের মধ্যে 'টিম্পানিক বুলা'-র ভেতরে অবস্থিত। এটি ক্ষুদ্র বায়ুপূর্ণ অসম আকৃতির প্রকোষ্ঠ। মধ্যকর্ণে দেখা যায়– ১. ইউস্টেশিয়ান নালি, ২. কর্ণাস্থি ও ৩. ছিদ্রপথ।

১। ইউস্টেশিয়ান নালি (Eustachian canal) : মধ্যকর্ণের গহ্বরটির নিচের দিকে ইউস্টেশিয়ান নালি বা শ্রুতিনালি হিসেবে প্রবর্ধিত। মধ্যকর্ণের গহ্বরটি এই নালির মাধ্যমে নাসাগলবিল বা গলবিলের সঙ্গে যুক্ত থাকে। ইতালিয়ান শৈল্যবিদ Bartolommo Eustachio এর নামানুসারে এর নামকরণ করা হয়েছে।

কাজ : কর্ণপটহের উভয় পাশের বায়ুচাপের সমতা রক্ষা করাই প্রধান কাজ। ইউস্টেশিয়ান নালির মাধ্যমে কানের বাইরে ও ভেতরে বায়ুচাপের সমতা বিরাজমান থাকে বলে **কর্ণপটহ** ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

চিত্র ৮.১৯ক : মানুষের কর্ণের গঠন

২। কর্ণাস্থি (Ear ossicles) : মধ্যকর্ণের গহ্বরে প্রাণীর কঙ্কালতন্ত্র থেকে তিনটি পরস্পরসংলগ্ন ক্ষুদ্রাস্থি বা কর্ণাস্থি সারিবদ্ধভাবে থাকে। এগুলো হলো– i. **ম্যালিয়াস**, ii. **ইনকাস** ও iii. **স্টেপিস**।

(i) ম্যালিয়াস (Malleus) : ম্যালিয়াস দেখতে অনেকটা হাতুড়ির মতো এবং বাইরের প্রান্ত টিম্পানিক পর্দাতে ও অপর প্রান্ত ইনকাসের সঙ্গে আটকানো থাকে।

(ii) ইনকাস (Incus) : এটি ম্যালিয়াসের পরের অস্থি। এটির আকার অনেকটা নেহাই-এর মতো। এটি ম্যালিয়াসকে স্টেপিসের সঙ্গে যুক্ত করে। এটি মানবদেহের সবচেয়ে ছোট ও হালকা অস্থি।

(iii) স্টেপিস (Stapes) : এটি দেখতে অনেকটা ঘোড়ার জিনের পাদানির মতো। এর এক প্রান্ত ইনকাসের সাথে এবং অন্য প্রান্ত ফেনেস্ট্রা ওভালিস নামে ছিদ্রের গায়ে বসানো থাকে।

কাজ : অস্থিগুলো বহিঃকর্ণের টিম্পানিক পর্দা থেকে শব্দতরঙ্গ অন্তঃকর্ণের পেরিলিম্ফে প্রেরণ করে।

৩। ছিদ্রপথ (Cavity way) : অন্তঃকর্ণের সাথে যোগাযোগের জন্য মধ্যকর্ণের পেরিওটিক অস্থি নির্মিত প্রাচীরে দুটি ছিদ্রপথ থাকে। যথা–

(i) ফেনেস্ট্রা ওভালিস (Fenestra ovalis) : এটি উপরের দিকের ডিম্বাকার ছিদ্রপথ। একে **কানের ডিম্বাকৃতির জানালা** (oval window) বলা হয়।

কাজ : এর মাধ্যমে শব্দতরঙ্গ মধ্যকর্ণ থেকে অন্তঃকর্ণে প্রবেশ করে।

(ii) ফেনেস্ট্রা রোটান্ডা (Fenestra rotanda) : এটি নিচের দিকের গোলাকার ছিদ্রপথ। একে **কানের গোলাকৃতির জানালা** (round window) বলা হয়।

কাজ : অন্তঃকর্ণের ককলিয়ায় শ্রবণ অনুভূতি সৃষ্টির পর অতিরিক্ত শব্দতরঙ্গ এ ছিদ্রপথে অন্তঃকর্ণ থেকে মধ্যকর্ণে ফিরে এসে প্রশমিত হয়।

(গ) অন্তঃকর্ণ (Internal ear)

পাতলা পর্দা জাতীয় **মেমব্রেনাস ল্যাবিরিন্থ** (membranous labyrinth), নামক জটিল অঙ্গ দ্বারা অন্তঃকর্ণ গঠিত। অন্তঃকর্ণ করোটির শ্রুতিকোটরের অভ্যন্তরে অবস্থিত। এটি অডিটরি ক্যাপসুলের মধ্যে **পেরিলিম্ফ** (perilymph) নামক তরল পদার্থপূর্ণ **অস্থিময় ল্যাবিরিন্থ** (bony labyrinth) দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। মেমব্রেনাস ল্যাবিরিন্থের অভ্যন্তরভাগ **এন্ডোলিম্ফে** (endolymph) পূর্ণ থাকে। অন্তঃকর্ণে নিম্নলিখিত ২টি প্রকোষ্ঠ থাকে। যথা: i. ইউট্রিকুলাস ও ii. স্যাকুলাস।

(i) ইউট্রিকুলাস (Utriculus) : এটি অন্তঃকর্ণের উপরের দিকের গোলাকার প্রকোষ্ঠ এবং আকারে বড়। ইউট্রিকুলাসের সঙ্গে ৩টি **অর্ধবৃত্তাকার নালি** যুক্ত থাকে। এগুলোর মধ্যে ২টি উল্লম্বভাবে এবং অপরটি আনুভূমিকভাবে অবস্থান করে। প্রতিটি নালির এক প্রান্ত স্ফীত হয়ে **অ্যাম্পুলা** (ampulla) গঠন করে। এদের অন্তঃপ্রাচীরের মধ্যে **সংবেদী কোষ** ও **রোম** (এগুলো ক্রিস্টি নামে পরিচিত) থাকে। রোমগুলো চুনময় **ওটোলিথ** (otolith) দানা সংবলিত জেলির মতো **ক্যুপুলায়** (cupula) আবৃত।

কাজ : দেহের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণে মস্তিষ্ককে সাহায্য করে এবং দেহ অবস্থানের অনুভূতির উদ্রেক করে।

(ii) স্যাকুলাস (Sacculus) : এটি অন্তঃকর্ণের নিচের দিকের অপেক্ষাকৃত ছোট প্রকোষ্ঠ। **স্যাকুলো-ইউট্রিকুলার** নামক একটি সংক্ষিপ্ত নালি দ্বারা এটি ইউট্রিকুলাসের সঙ্গে যুক্ত থাকে। স্যাকুলাস থেকে যে অস্থিময় নলটি পেছনের দিকে শামুকের ন্যায় প্যাঁচানো থাকে, একে **ককলিয়া** (cochlea). বলে।

কাজ : শ্রবণ অনুভূতি জাগানো স্যাকুলাসের কাজ।

চিত্র ৮.১৯খ : (ক) মানুষের অন্তঃকর্ণ (মেমব্রেনাস ল্যাবিরিন্থ); (খ) ককলিয়ার প্রস্থচ্ছেদ

CamScanner

ককলিয়ার গঠন : অন্তঃকর্ণের বা **মেমব্রেনাস** ল্যাবিরিন্থের স্যাকুলাসের পেছনের অংশ নলাকার ধারণ করে ও বিশেষভাবে চক্রাকারে পেঁচিয়ে একটি শামুকের খোলকের মতো প্যাঁচানো অঙ্গ বা ককলিয়ায় পরিণত হয়। ককলিয়ার গঠন বেশ জটিল। ককলিয়া যে অস্থি গঠিত গহ্বরে অবস্থান করে তাকে **অস্থিময় ল্যাবিরিন্থ** (bony labyrinth) বলে। এটি পেরিলিম্ফ নামক তরলে পূর্ণ থাকে। ককলিয়ার প্রকোষ্ঠটি **রেসনার** (reissner) পর্দা ও **বেসিলার** (basilar) পর্দা দিয়ে ৩টি গহ্বরে বিভক্ত থাকে। প্রকোষ্ঠ ৩টি হলো–

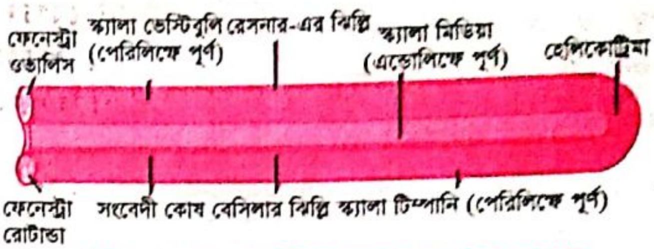

চিত্র ৮.১৯গ : ককলিয়া সোজা দেখানো হয়েছে

(i) স্ক্যালা ভেস্টিবুলি (scala vestibuli) : এটি ককলিয়া নালির উপরের দিকে অবস্থিত এবং **পেরিলিম্ফ** নামক তরলে পূর্ণ থাকে।

(ii) স্ক্যালা মিডিয়া (scala media) : এটি বেসিলার পর্দার নিচের প্রকোষ্ঠ এবং **এন্ডোলিম্ফ** নামক তরলে পূর্ণ থাকে। এটি উপরে রেসনারের ঝিল্লি ও নিচে বেসিলায় ঝিল্লিতে আবদ্ধ।

(iii) স্ক্যালা টিম্পানি (scala tympani) : এই গহ্বর ককলিয়া নালির অঙ্কীয় দিকে অবস্থিত এবং পেরিলিম্ফ নামক তরলে পূর্ণ থাকে। ককলিয়া নালির অভ্যন্তরে বেসিলার পর্দার এপিথেলিয়াম কোষগুলো রূপান্তরিত হয়ে **অর্গান অব কর্টি** (organ of corti) গঠন করে। অর্গান অব কর্টি রোম কোষ বা লোম কোষ (hair cells) গঠন করে, যা শ্রবণ সংবেদী। একেবারে শীর্ষে ককলিয়ার উর্ধ্ব ও নিম্ন প্রকোষ্ঠ একটি সরু নলাকার অংশের সাহায্যে পরস্পর যুক্ত। এর নাম **হেলিকোট্রিমা** (helicotrema)।

কাজ : শ্রবণের অনুভূতি সৃষ্টি করে।

স্নায়ু সংযোগ : মস্তিষ্কের অডিটরি স্নায়ুর শাখাসমূহ অর্ধবৃত্তাকার নালিসমূহের অ্যাম্পুলা এবং ককলিয়ার অর্গান অব কর্টিতে বিস্তার লাভ করে।

কাজ : প্রাণীর আপেক্ষিক অবস্থানের বার্তা মস্তিষ্কে প্রেরণপূর্বক ভারসাম্য রক্ষা করে এবং শ্রবণের অনুভূতি মস্তিষ্কে প্রেরণ করে।

শ্রবণ ও ভারসাম্য রক্ষায় কানের ভূমিকা (Role of Ear in Hearing and Balancing)

শ্রবণ কৌশল (Hearing Mechanism)

বহিরাগত শব্দতরঙ্গ পিনার দ্বারা সংগৃহীত হয়ে বহিঃঅডিটরিমিটাসে প্রবেশ করে এবং টিম্পানিক পর্দায় ধাক্কা দেয়। ফলে টিম্পানিক পর্দা কম্পিত হয়। এই কম্পন মধ্যকর্ণের অস্থিত্রয়ের (ম্যালিয়াস, ইনকাস ও স্টেপিস) মাধ্যমে ফেনেস্ট্রা ওভালিসের পর্দাকে আঘাত করে অন্তঃকর্ণে প্রবেশ করে। এর ফলে অন্তঃকর্ণের পেরিলিম্ফে কম্পন সৃষ্টি হয়। পেরিলিম্ফে শব্দতরঙ্গের শক্তি প্রায় ২০ গুণ বৃদ্ধি পায়। এরপর শব্দতরঙ্গ পেরিলিম্ফের মধ্য দিয়ে স্ক্যালা ভেস্টিবুলি ও স্ক্যালা টিম্পানি হয়ে অন্তঃকর্ণের ককলিয়ার এন্ডোলিম্ফে অবস্থিত **শ্রুতিগ্রাহক যন্ত্র** বা **কর্টি যন্ত্রে** যায় এবং সংবেদী কোষগুলোকে উত্তেজিত করে।

চিত্র ৮.২০ : কানের ভেতরের শব্দতরঙ্গের গতিপথ (ককলিয়া সোজা করে দেখানো হয়েছে)

CamScanner

এ উত্তেজনা স্নায়ুর স্পন্দনরূপে অডিটরি স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কের শ্রবণকেন্দ্রে পৌছালে ক্রমশ প্রাণী শব্দটি শুনতে পায়। অতঃপর অবশিষ্ট শব্দ তরঙ্গ ফেনেস্ট্রা রোটান্ডার পর্দার মাধ্যমে মধ্যকর্ণে চলে আসে এবং প্রশমিত হয়ে যায়। এজন্য ফেনেস্ট্রা রোটান্ডাকে **pressure relief valve** বলে।

শ্রবণ কৌশলের রেখাচিত্র :

শব্দতরঙ্গ → পিনা → বহিঃঅডিটরি মিটাস → টিম্পানিক মেমব্রেন → মধ্যকর্ণের অস্থিত্রয় → ককলিয়া
↓
শ্রবণ ← মস্তিষ্কের শ্রবণ কেন্দ্র ← অডিটরি স্নায়ু ← স্নায়ুস্পন্দন ← সংবেদী কোষের উত্তেজনা সৃষ্টি ← কর্টিযন্ত্র

ভারসাম্য রক্ষায় (Balancing of the body)

অন্তঃকর্ণের অর্ধবৃত্তাকার নালি, ইউট্রিকুলাস এবং স্যাকুলাস (ককলিয়া ব্যতীত) ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। কোনো কারণে প্রাণী ব্যালান্স হারালে বা স্থানচ্যুত হলে ক্রিস্টি (অন্তঃকর্ণের অ্যাম্পুলার অনুভূতিশীল রোমকোষ, এ কোষের রোমগুলোর সাথে ক্যুপুলা নামক জেলির মতো বস্তু সংযুক্ত থাকে) ও ম্যাকুলির (ইউট্রিকুলাস এবং স্যাকুলাসের মধ্যে সেনসরি কোষ ও ধারক কোষ সমন্বিত সেনসরি প্যাঁচ) রোম কোষগুলো উদ্দীপিত হয়। এই উদ্দীপনা আসে এন্ডোলিম্ফ ও অটোলিথের ($CaCO_3$ গঠিত চূর্ণকময় দানা) সঞ্চালন এবং ক্যুপুলার (cupula) অবস্থান পরিবর্তনের ফলে। এই উদ্দীপনা অডিটরি স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কের মেডুলা অবলংগাটায় পৌঁছায়। তখন মস্তিষ্ক থেকে সাড়া (response) বিভিন্ন পেশিতে পাঠায়। পেশিগুলো সংকুচিত হলে ভারসাম্য রক্ষিত হয়।

চিত্র ৮.২১ : ভারসাম্য রক্ষার কৌশল

> ❑ **কাজ :** (i) মানব অন্তঃকর্ণের গঠন বর্ণনা কর। (ii) মানব অন্তঃকর্ণের ইউট্রিকুলাস এর গঠন ও কাজ বর্ণনা কর। (iii) মানব কর্ণ কীভাবে শ্রবণে ভূমিকা পালন করে– বিশ্লেষণ কর। (iv) মানুষের কানের শ্রবণ ও ভারসাম্য রক্ষায় ক্ষুদ্র অস্থিসমূহ কী ভূমিকা পালন করে? যুক্তিসহ বুঝিয়ে লেখ। (v) মানবকর্ণের গঠনগত প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার শব্দ নিয়ন্ত্রণে সক্ষম– বিশ্লেষণ কর। (vi) মধ্যকর্ণ ও অন্তঃকর্ণ কীভাবে শ্রবণে সাহায্য করে– ব্যাখ্যা কর। (vii) অন্তঃকর্ণের কাজ কি শুধুই শ্রবণ? তোমার মতামত ব্যক্ত কর। (viii) মানবকর্ণের সার্বিক কার্যকলাপ মানবজীবনের জন্য অত্যন্ত জরুরি– বিশ্লেষণ কর।

৮.৫ রাসায়নিক সমন্বয় (Chemical Co-ordination)

যে পদ্ধতিতে হরমোন বা উত্তেজক রস বা জৈব রাসায়নিক পদার্থ প্রাণিদেহের অভ্যন্তরীণ ক্রিয়া প্রণালির অখণ্ডতা ও সমন্বয় সাধন করে, সেই পদ্ধতি এবং ক্রিয়াশীলতাকে **রাসায়নিক সমন্বয়** (chemical co-ordination) বলে। আর ওই জৈব রাসায়নিক পদার্থ বা হরমোনকে **রাসায়নিক সমন্বয়ক** (chemical co-ordinator) বলে। কখনো কখনো প্রাণিদেহের এই সমন্বয় সাধন ও অখণ্ডতা রক্ষায় স্নায়ুতন্ত্রেরও সহযোগিতা প্রয়োজন হয়। দূত যেমন এক দেশের বার্তা বা সংবাদ আর এক দেশে বহন করে নিয়ে যায়, অনুরূপভাবে হরমোনগ্রন্থিগুলো এক জায়গায় উৎপন্ন হয়ে অর্থাৎ উৎপত্তিস্থল থেকে অপর কোনো জায়গায় অর্থাৎ বহু দূরে পরিবাহিত হয়ে রাসায়নিক বার্তা বহন করে সেখানকার অঙ্গকে উদ্দীপিত বা ক্রিয়াশীল করে। বহুকোষী প্রাণীর জীবনধারণের জন্য শর্করা, ফ্যাট, প্রোটিন, ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানি এ ৬টি পদার্থ একান্ত প্রয়োজন। তবু জীবদেহের স্বাভাবিক ও সার্বিক বৃদ্ধি, জৈবিক কার্যাবলি সুসম্পন্ন হয় না, তার জন্য স্নায়ুজ ও রাসায়নিক সমন্বয় প্রয়োজন।

CamScanner

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির অবস্থান, নিঃসরণ ও ক্রিয়া
(Position, Secretion and Action of Endocrine gland)

গ্রন্থি (Gland)

গঠনগত ও কার্যগতভাবে বিশেষিত যে কোষ বা কোষগুচ্ছ যখন শারীরবৃত্তীয় বা জৈবনিক প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় রস বা রাসায়নিক পদার্থ সৃষ্টি করে তখন তাকে **গ্রন্থি** (gland) বলে। ক্ষরণ গুণসম্পন্ন একটি মাত্র কোষ বা কোষগুচ্ছ নিয়ে গ্রন্থি গঠিত হয়। গ্রন্থি এক ধরনের রূপান্তরিত আবরণী টিস্যু। নিঃসরণ ধরনের ওপর ভিত্তি করে গ্রন্থি তিন প্রকার। যথা– **বহিঃক্ষরা গ্রন্থি, অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি ও মিশ্র গ্রন্থি**।

১। বহিঃক্ষরা গ্রন্থি (Exocrine gland) : প্রাণিদেহের যেসব গ্রন্থির নিজস্ব নালি আছে এবং এদের ক্ষরণ নালির মাধ্যমে গ্রন্থির বাইরে আসে তাদের **বহিঃক্ষরা গ্রন্থি** বলে। বহিঃক্ষরা গ্রন্থি নিঃসৃত রসের নাম এনজাইম, লালা, মিউকাস, ঘাম, সেরাম, দুধ ইত্যাদি। উদাহরণ– লালাগ্রন্থি, যকৃৎ, ঘর্মগ্রন্থি, স্তনগ্রন্থি, সেবেসিয়াস গ্রন্থি ইত্যাদি।

২। অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি (Endocrine gland) : প্রাণিদেহের যেসব গ্রন্থির নিজস্ব নালি নেই এবং এদের ক্ষরিত রস সরাসরি রক্ত বা লসিকায় ক্ষরিত হয়, তাদের **অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি** বলে। অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি নিঃসৃত রসের নাম **হরমোন** (hormone)। উদাহরণ– পিটুইটারি গ্রন্থি, থাইরয়েড গ্রন্থি, অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি ইত্যাদি।

৩। মিশ্র গ্রন্থি (Mixed gland) : প্রাণিদেহের যেসব গ্রন্থি বহিঃক্ষরা ও অন্তঃক্ষরা উভয় প্রকার কোষের সমন্বয়ে গঠিত তাদের **মিশ্র গ্রন্থি** বলে। উদাহরণ– অগ্ন্যাশয়, শুক্রাশয়, ডিম্বাশয়।

মানবদেহে উল্লেখযোগ্য অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিসমূহ (সিলেবাসভুক্ত)

১। হাইপোথ্যালামাস (Hypothalamus)

মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস অংশ অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি হিসেবে কাজ করে। হাইপোথ্যালামাস নিঃসৃত হরমোনগুলো পিটুইটারি গ্রন্থির হরমোন ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে। এজন্য একে **সুপ্রিম কমান্ডার** (supreme commandar) বা The Bandmaster of Endocrine Orchestra বলে। হাইপোথ্যালামাস থেকে ক্ষরিত পদার্থকে **নিউরোহরমোন** (neurohormone) বলে। পূর্বে এসব হরমোনকে **রিলিজিং ফ্যাক্টর** (releasing factors) বলা হতো।

অবস্থান : হাইপোথ্যালামাস অগ্রমস্তিষ্কের অংশ। এটি থ্যালামাসের নিচে অবস্থিত এবং ইনফান্ডিবুলাম দ্বারা পিটুইটারি গ্রন্থির সাথে যুক্ত থাকে।

হাইপোথ্যালামাস ক্ষরিত হরমোনসমূহের নাম ও কাজ

হরমোনের নাম	প্রভাবিত অংশ	কাজ
১। গ্রোথ হরমোন রিলিজিং হরমোন বা সোমাটোট্রপিন রিলিজিং হরমোন (Growth hormone releasing hormone/ Somatotropin releasing hormone-GHRH/SRH)	অগ্র পিটুইটারি	গ্রোথ হরমোন (GH) বা সোমাটোট্রপিন হরমোন (STH) ক্ষরণে উদ্দীপনা জোগায়।
২। গ্রোথ হরমোন ইনহিবিটিং হরমোন বা সোমাটোস্ট্যাটিন (Growth hormone inhibiting hormone/Somatostatin-GHIH/SS)	অগ্র পিটুইটারি	GH বা STH ক্ষরণে বাধা দেয়।
৩। কর্টিকোট্রপিন রিলিজিং হরমোন (Corticotropin releasing hormone -CRH)	অগ্র পিটুইটারি	অ্যাড্রিনোকরটিকোট্রপিন হরমোন (ACTH) ক্ষরণে উদ্দীপনা জোগায়।
৪। থাইরোট্রপিন রিলিজিং হরমোন (Thyrotropin releasing hormone -TRH)	অগ্র পিটুইটারি	থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন (TSH) ক্ষরণে উদ্দীপনা জোগায়।
৫। গোনাডোট্রপিন রিলিজিং হরমোন (Gonadotropin releasing hormone -GnRH)	অগ্র পিটুইটারি	ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন (FSH) ও ল্যুটিনাইজিং হরমোন (LH) ক্ষরণে উদ্দীপনা জোগায়।

CamScanner

হরমোনের নাম	প্রভাবিত অংশ	কাজ
৬। প্রোল্যাকটিন রিলিজিং হরমোন বা ডোপামিন (Prolactin releasing hormone -PRH/Dopamine-DA)	অগ্র পিটুইটারি	প্রোল্যাকটিন বা বা ল্যাটিওট্রপিক হরমোন (LTH) ক্ষরণে উদ্দীপনা জোগায়।
৭। প্রোল্যাকটিন ইনহিবিটিং হরমোন বা ডোপামিন (Prolactin inhibiting hormone -PIH/Dopamine-DA)	অগ্র পিটুইটারি	প্রোল্যাকটিন বা LTH ক্ষরণে বাধা দেয়।
৮। মেলানোসাইট রিলিজিং হরমোন (Melanocyte releasing hormone-MRH)	পিটুইটারির মধ্য খণ্ড	মেলানোসাইট স্টিমুলেটিং হরমোন (MSH) ক্ষরণে উদ্দীপনা জোগায়।
৯। মেলানোসাইট ইনহিবিটিং হরমোন (Melanocyte inhibiting hormone-MIH)	পিটুইটারি মধ্য খণ্ড	MSH ক্ষরণে বাধা দেয়।

২। পিটুইটারি গ্রন্থি (Pituitary gland)

পিটুইটারি গ্রন্থি দেহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষুদ্র এবং শক্তিশালী গ্রন্থি। এই গ্রন্থি থেকে সর্বাধিক হরমোন নিঃসৃত হয় এবং অন্যান্য গ্রন্থির হরমোন নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ করে বলে একে **গ্রন্থিরাজ** বা **প্রভুগ্রন্থি** (master gland) বলে। **পিটুইটারি গ্রন্থির কার্যকারিতা আবার মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।**

অবস্থান ও আকৃতি : অগ্রমস্তিষ্কের পশ্চাৎভাগের অঙ্কীয়দেশে অপটিক কায়াজমার পেছনে মটর দানার মতো পিটুইটারি গ্রন্থি অবস্থান করে। এটি ধূসর লাল বর্ণের। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের ক্ষেত্রে এর ওজন ০.৫-০.৬ গ্রাম। স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে এর ওজন সামান্য বেশি (০.৬-০.৭ গ্রাম)।

শারীরস্থানিকভাবে (anatomically) পিটুইটারি গ্রন্থি দুটি খণ্ডের সমন্বয়ে গঠিত। যথা– **অগ্র পিটুইটারি** (anterior pituitary) বা **অ্যাডিনোহাইপোফাইসিস** (adenohypophysis) ও **পশ্চাৎ পিটুইটারি** (posterior pituitary) বা **নিউরোহাইপোফাইসিস** (neurohypophysis)। এ দু'খণ্ডের মাঝে **পারস ইন্টারমিডিয়া** (pars-intermedia) বা **মধ্য পিটুইটারি** নামক একটি ক্ষুদ্রাকার অংশ থাকে। ভ্রূণীয় পর্যায়ে এ অংশ থেকে **মেলানোসাইট স্টিমুলেটিং হরমোন** (Melanocyte Stimulating Hormone-MSH) নিঃসৃত হয়, যা মেলানোসাইট কোষকে উদ্দীপিত করে ত্বক ও চুলের বর্ণ নিয়ন্ত্রণ এবং আলো প্রতিরোধক (photoprotection) হিসেবে কাজ করে। প্রাপ্তবয়সে এ অংশ ক্ষুদ্রাকার এবং নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে।

(ক) অগ্র পিটুইটারি : পিটুইটারি গ্রন্থির এই খণ্ড থেকে ৬টি **ট্রপিক হরমোন** (tropic hormone- যেসব হরমোন অপর অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিকে হরমোন ক্ষরণে উদ্দীপিত করে তাদের ট্রপিক হরমোন বলে) নিঃসৃত হয়। হরমোনগুলোর নাম ও কাজ নিম্নরূপ :

(i) ফলিকল উদ্দীপক হরমোন (Follicle Stimulating Hormone-FSH) : এ হরমোন প্রধান কাজ হচ্ছে স্ত্রী প্রাণীতে ডিম্বথলির পরিণতি (graafian follicle), ওভুলেশন (ovulatin, ডিম্বথলি থেকে ডিম্বাণু নির্গমন), ইস্ট্রোজেন ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতিতে ভূমিকা রাখে। পুরুষদের ক্ষেত্রে শুক্রাশয়ের সেমিনিফেরাস নালিকার (seminiferous tubule) বৃদ্ধিকে উদ্দীপিত করে শুক্রাণুজনন (শুক্রাণু উৎপাদন) ঘটায়। এছাড়া সারটোলির কোষের বৃদ্ধিতে উদ্দীপনা জোগায়।

(ii) ল্যুটিনাইজিং হরমোন (Luteinizing Hormone-LH) : এ হরমোন স্ত্রী প্রাণীতে ফলিকল থেকে পরিপক্ব ডিম্বাণু অবমুক্তিতে, কর্পাস লিউটিয়াম (corpus leutium) তৈরিতে এবং ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরন উৎপাদনে সাহায্য করে। পুরুষদের ক্ষেত্রে শুক্রাশয়ের লেডিগের ইন্টারস্টিশিয়াল কোষসমূহকে উদ্দীপিত করে এন্ড্রোজেন (টেস্টোস্টেরন) হরমোনের ক্ষরণ ঘটায়।

(iii) প্রোল্যাক্টিন বা ল্যুটিওট্রপিক হরমোন (Prolactin-PRL or Luteotropic Hormone-LTH) : এ হরমোন স্তনগ্রন্থির বিকাশ, দুগ্ধগ্রন্থি থেকে দুগ্ধ তৈরি ও নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ করে, অনাক্রম্যের প্রতি সাড়াদান, দুগ্ধদানকারী মায়ের ডিম্বনিঃসরণ বন্ধ রাখে এবং গোনাডোট্রফিকের সক্রিয়তায় বাধা দেয়। এছাড়া পরিস্ফুটনের সময় নতুন রক্তকণিকা উৎপাদনে ভূমিকা রাখে এবং পুরুষ ও স্ত্রীদের গৌণ যৌন অঙ্গের বিকাশ ঘটায়।

(iv) থাইরয়েড উদ্দীপক হরমোন (Thyroid Stimulating Hormone-TSH) : এ হরমোন থাইরয়েড গ্রন্থির বৃদ্ধি, থাইরক্সিন হরমোনের সংশ্লেষ ও উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে। থাইরয়েড গ্রন্থি কোষ কর্তৃক আয়োডিন গ্রহণ নিয়ন্ত্রণ করে।

CS CamScanner

(v) অ্যাড্রিনাল উত্তেজক হরমোন (Adrenocorticotropic Hormone-ACTH) : এটি অ্যাড্রিনাল গ্রন্থির কর্টেক্সের বৃদ্ধি ঘটিয়ে হরমোন (গ্লুকোকর্টিকয়েড) ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে। এটি মেলানোসাইট উৎপাদনকে প্রভাবিত করে।

(vi) সোমাটোট্রপিন হরমোন বা দেহ বৃদ্ধিকারক হরমোন (Somatotropin Hormone or Growth Hormone-STH/GH) : এ হরমোন সার্বিকভাবে দেহের বৃদ্ধি ঘটায়, বিশেষ করে অস্থি ও পেশির বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে। দেহে বিভিন্ন খাদ্য বিপাক (বিশেষ করে প্রোটিন সংশ্লেষ) ও কোষের সংখ্যাবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে। রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বাড়ায় কিন্তু অস্থি ও হৃৎপেশির সঞ্চিত গ্লাইকোজেন কমায়। দেহের সঞ্চিত ফ্যাটকে কমিয়ে প্লাজমায় এর পরিমাণ বাড়ায়।

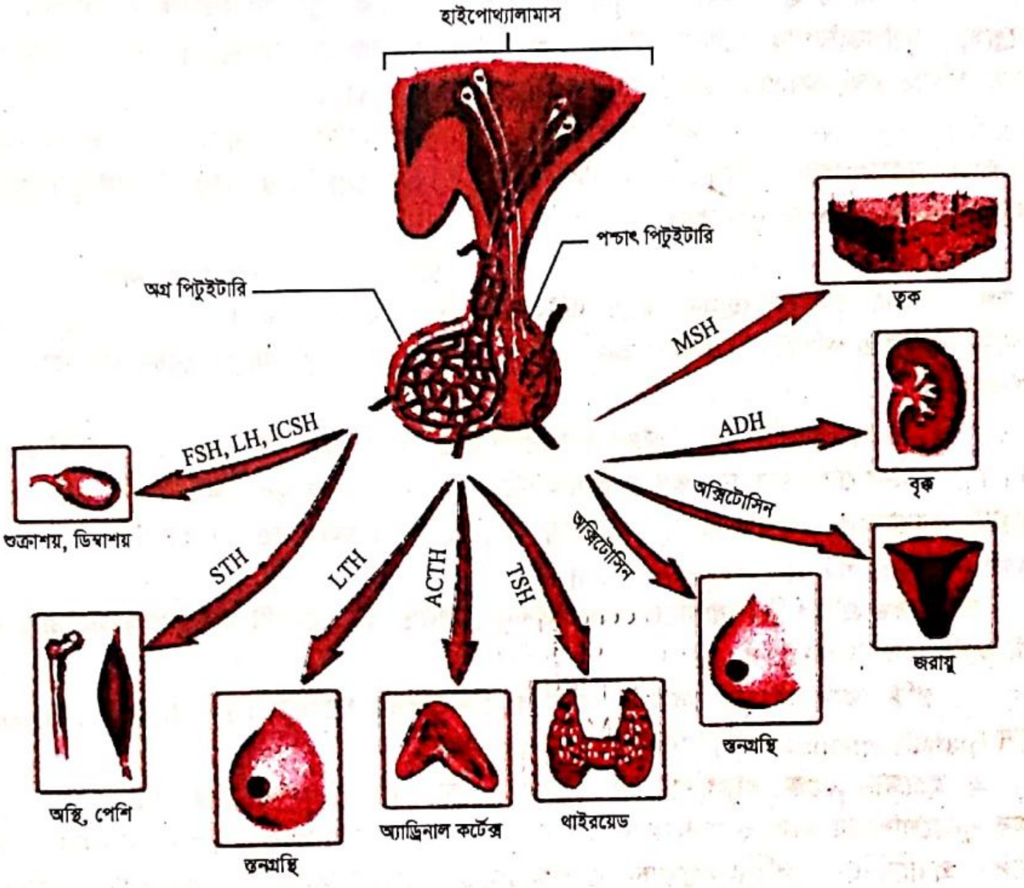

চিত্র ৮.২২ : অগ্র পিটুইটারি গ্রন্থি নিঃসৃত হরমোনের বিপাকীয় ক্রিয়া

(খ) পশ্চাৎ পিটুইটারি গ্রন্থি নিঃসৃত হরমোন–

(i) অক্সিটোসিন হরমোন (Oxytocin Hormone) : সন্তান প্রসবকালে জরায়ুর মসৃণ পেশির সংকোচন ত্বরান্বিত করে প্রসব সহজ করে এবং দুগ্ধগ্রন্থি থেকে দুগ্ধ নির্গমনেও সাহায্য করে।

(ii) ভেসোপ্রেসিন বা পিট্রেসিন বা অ্যান্টিডাইইউরেটিক হরমোন (Vesopressin or Pitressin or Anti-diuretic Hormone-ADH) : এ হরমোন রক্তচাপ বৃদ্ধি করে; পানির সমতা বজায় রাখে; মূত্রে পানির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে; বৃক্কের পানি শোষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে মূত্রের উৎপাদন হ্রাস করে; শ্বাসক্রিয়াকে প্রভাবিত করে; ক্লোরাইড বিশোষণ হ্রাস করে ক্লোরাইডের রেচন বৃদ্ধি করে; পাকস্থলী ও অন্ত্রের ক্রমসংকোচন (peristalsis) বৃদ্ধি করে এবং বিভিন্ন অনৈচ্ছিক পেশির (যেমন– ধমনি, ক্ষুদ্রান্ত্র, পিত্তাশয়, ইউরেটার, মূত্রনালি ইত্যাদির পেশি) সংকোচন ঘটাতে উদ্বুদ্ধ করে।

> **কাজ :** (i) পিটুইটারি গ্রন্থি কীভাবে অন্যান্য গ্রন্থির ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে– ব্যাখ্যা কর। (ii) পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত গ্রোথ হরমোন মানুষের উচ্চতা নির্ধারণে ভূমিকা রাখে– ব্যাখ্যা কর। (iii) পিটুইটারি গ্রন্থি কীভাবে থাইরয়েড গ্রন্থির কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে– ব্যাখ্যা কর।

CamScanner

৩। থাইরয়েড গ্রন্থি (Thyroid gland)

অবস্থান : মানবদেহে এ গ্রন্থি গলার শ্বাসনালির অঙ্কীয়দেশে এবং স্বরযন্ত্রের ঠিক নিচে অর্থাৎ শ্বাসনালির দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ তরুণাস্থি বলয়ের সম্মুখে অবস্থিত। এটি দুটি খণ্ডের সমন্বয়ে গঠিত যারা **'ইথমাস** '(isthmus)' নামক একটি পাতলা কলাপাত (tissue band) দ্বারা যুক্ত থাকে। এটি দেখতে প্রজাপ্রতির ন্যায়। পূর্ণবয়স্ক মানুষের থাইরয়েড গ্রন্থির ওজন ২০-২৫ গ্রাম।

নিঃসরণ : এ গ্রন্থি থেকে নিম্নলিখিত ৩টি সক্রিয় হরমোন ক্ষরিত হয়।

(i) ট্রাই-আয়োডোথাইরোনিন (Triiodothyrorine-T_3) : শর্করার জারণ ঘটিয়ে শক্তি উৎপাদনে সহায়তা করে; মৌল (আয়োডিন) বিপাকীয় হার ও হৃৎস্পন্দন হার বৃদ্ধি করে; শর্করা বিপাক (গ্লুকোজ সংশ্লেষ ও শোষণ), প্রোটিন বিপাক (প্রোটিন সংশ্লেষ) ও লিপিড বিপাক (কোলেস্টেরল ও অন্যান্য লিপিড সংশ্লেষ) প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। এটি স্নায়ুতন্ত্রের সংবেদনশীলতা বৃদ্ধিতে এবং ভ্রূণ ও শিশুর পরিস্ফুটনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

(ii) থাইরক্সিন (Thyroxine-T_4) : থাইরয়েড গ্রন্থির প্রায় ৯৫%ই থাইরক্সিন হরমোন। এ হরমোন দৈহিক ও মানসিক বৃদ্ধি ও যৌন লক্ষণ প্রকাশে সাহায্য করে। বিভিন্ন পদার্থের (আয়োডিন, প্রোটিন ও শর্করা) বিপাকীয় হারকে নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়াও হৃৎক্রিয়া ও দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি করে।

(iii) থাইরোক্যালসিটোনিন (Thyrocalcitonin-TCT) : এটি রক্তে ক্যালসিয়ামের মাত্রা কমাতে এবং অস্থিতে ক্যালসিয়াম সঞ্চয়ের মাত্রা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে; এটি অস্থির ক্ষয় তথা অস্টিওপোরোসিস (osteoporosis) রোধ করে; দেহে ফসফেটের বিপাক ও পরিবহনে সহায়তা করে; এটি মূত্রের মাধ্যমে ক্যালসিয়ামের রেচন বৃদ্ধি করে এবং ভিটামিন D নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে।

[**প্রাসঙ্গিক তথ্য :** গুণগতভাবে T_3 ও T_4 উভয় হরমোনের কাজ অভিন্ন কিন্তু কাজের দ্রুততা এবং তীব্রতায় এরা পরস্পর থেকে পৃথক। T_3, T_4-এর চেয়ে প্রায় চার গুণ ও অধিক সক্রিয়। তবে T_3 রক্তে খুব অল্প পরিমাণে থাকে এবং এটি T_4-এর তুলনায় স্বল্পস্থায়ী। সাধারণত T_4 থেকে সক্রিয় T_3 উৎপন্ন হয়। T_4-কে **প্রোহরমোন**ও বলা হয়।]

৪। প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি (Parathyroid gland)

অবস্থান : থাইরয়েড গ্রন্থির ঠিক পশ্চাতে এবং অংশিক প্রোথিত অবস্থায় ৪টি প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি থাকে। এ গ্রন্থি হলুদ-বাদামি বর্ণের এবং ডিম্বাকৃতির।

নিঃসরণ : এ গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হরমোন হলো **প্যারাথাইরয়েড হরমোন** (parathyroid hormone- PTH) বা **প্যারাথরমোন** (parathormone) বা **প্যারাথাইরিন** (parathyrin)।

কাজ : এ হরমোন রক্তে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ বৃদ্ধি করে ও ফসফেটের মাত্রা হ্রাস করে; এটি বৃক্কে ক্যালসিয়ামের পুনঃশোষণের মাত্রা ও ফসফেটের রেচন বৃদ্ধি করে; অন্ত্র ও অস্থি থেকে ক্যালসিয়াম (রক্ত, হাড়, পেশি ও স্নায়ু উদ্দীপনা প্রবাহে এবং পেশির সংকোচন ও রক্ত জমাট বাঁধায় ক্যালসিয়ামের গুরুত্ব অপরিসীম) ও ফসফেটের শোষণ ত্বরান্বিত করে। রক্তে ফসফেটের মাত্রা কমাতে এবং ভিটামিন D-কে সক্রিয়করণে ভূমিকা রাখে। ভিটামিন D-এর অভাব হলে বাচ্চাদের **রিকেটস** (rickets) রোগ ও বয়স্কদের **অস্টিওম্যালাসিয়া** (osteomalacia) হয়।

৫। অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি বা সুপ্রারেনাল গ্রন্থি (Adrenal gland or Suprarenal gland)

অবস্থান : দুটি কিডনি বা বৃক্কের অগ্রভাগ বা উপরে টুপির মতো বৃক্কের সাথে এ গ্রন্থি যুক্ত থাকে। যোজক কলায় গঠিত একটি সাধারণ আবরণ **রেনাল ফেসিয়া বা গ্যারোটা ফেসিয়া** (renal fascia or Gerota fascia) দ্বারা বৃক্ক ও অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি উভয়েই আবৃত থাকে। এটি প্রায় ত্রিকোনাকার এবং বাইরের দিকে হলুদ অথবা বাদামি বর্ণের হয়। প্রতিটি গ্রন্থি দুটি অংশে বিভক্ত। এর বাইরের অংশকে **কর্টেক্স** (৮০%) এবং ভেতরের দিকের অংশকে **মেডুলা** (২০%) বলে। এদের ওজন ৩-৫ গ্রাম।

নিঃসরণ :

(ক) কর্টেক্স থেকে নিঃসৃত হরমোন–

(i) গ্লুকোকর্টিকয়েড (Glucocorticoid) : এ হরমোন শর্করা (প্রধানত) ও প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে এবং যকৃৎ ও পেশিতে গ্লাইকোজেনের মজুদের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। অন্ত্র থেকে চিনি ও লিপিড শোষণে সহায়তা করে। এটি শ্বেত রক্তকণিকার প্রদাহজনিত কার্যকারিতা হ্রাস করে। অর্থাৎ ফ্যাগোসাইটোসিস, কেমোট্যাক্সিস, অ্যালার্জি ইত্যাদিতে বাধা দেয়। অ্যান্টিবডি উৎপাদন হ্রাস করে। উদাহরণ– কর্টিসল (cortisol), কর্টিসোন (cortison), কর্টিকোস্টেরন (corticosterone) ইত্যাদি।

CS CamScanner

(ii) মিনারালোকর্টিকয়েড (Mineralocorticoid) : এ গ্রুপভুক্ত হরমোন খনিজ লবণের বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে। রক্ত ও কলাকোষে NaCl-এর পরিমাণ বজায় রাখে। বৃক্কের NaCl ও পানি শোষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। রক্তের প্লাজমা বৃদ্ধি করে। দেহ থেকে পটাশিয়াম ও ফসফেটের নির্গমনে সাহায্য করে। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে। উদাহরণ– অ্যালডোস্টেরন।

(iii) যৌন হরমোন বা গোনাডোকর্টিকয়েড (Sex hormone or Gonadocorticoids) : **অ্যান্ড্রোজেন, ইস্ট্রোজেন** ও **প্রোজেস্টেরন** নামক যৌন হরমোনগুলো যৌনাঙ্গের বর্ধন ও যৌন লক্ষণ প্রকাশে সাহায্য করে। ভ্রূণের যৌন বিভেদ নিয়ন্ত্রণ করে।

(খ) মেডুলা থেকে নিঃসৃত হরমোন–

(i) এপিনেফ্রিন (Epinephrine) বা এড্রেনালিন (Adrenaline) : যকৃতে সঞ্চিত গ্লাইকোজেন থেকে গ্লুকোজ অবমুক্ত করে বিপাকের হার বাড়িয়ে দেয়। হৃৎস্পন্দন হার, রক্তচাপ, শ্বাসক্রিয়া ইত্যাদি বৃদ্ধি করে। হৃৎপিণ্ড ও অনৈচ্ছিক পেশির সংকোচন নিয়ন্ত্রণ করে। পেশি, যকৃৎ ও মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহ বৃদ্ধি করে। মূত্র তৈরি হ্রাস করে। দেহের উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ করে এবং ভয়, আনন্দ ও শোক প্রকাশে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। একে **সংকটকালীন বা আপদকালীন বা জরুরিকালীন হরমোন** (emergency hormone) বলা হয়।

(ii) নর-এপিনেফ্রিন (Nor-epinephrine) বা নর-এড্রেনালিন (Nor-adrenaline) : এ হরমোনের শারীরবৃত্তীয় প্রভাব অনেকটা এপিনেফ্রিন-এর মতো। তবে এড্রেনালিন হরমোনের কাজের প্রভাব নর-এড্রেনালিন হরমোনের চেয়ে ৫-১০ গুণ বেশি হয়। এটি রক্তচাপ ও হৃৎস্পন্দন সামান্য বৃদ্ধি করে। হৃৎপেশিকে উদ্দীপ্ত করে। যকৃৎ ও পেশিতে গ্লাইকোজেনোলাইসিসের হার বৃদ্ধি করে, অর্থাৎ দেহের অতিরিক্ত গ্লুকোজ গ্লাইকোজেনে রূপান্তরিত করে। দেহের বিপাকীয় ক্রিয়ার হার সামান্য বাড়ায়। দেহের প্রায় সকল রক্ত নালিকার ও রেচন নালিকার সংকোচন ঘটায়। চোখের অশ্রু উৎপাদন বৃদ্ধি করে চোখকে সিক্ত রাখে।

৬। জনন গ্রন্থি বা গোনাড (Gonad)

অবস্থান : জননকোষ উৎপাদনকারী অঙ্গকে গোনাড বা জননাঙ্গ বলে। দুটি শ্রোণিচক্রের মধ্যবর্তী স্থানে কটিদেশের নিচে গোনাড বা জননাঙ্গ অবস্থান করে। তবে স্ত্রী ও পুরুষ প্রাণীতে সামান্য ব্যবধানে অবস্থান করে। গোনাড পূর্ণাঙ্গ পুরুষ প্রাণীতে শুক্রাশয়ে এবং স্ত্রী প্রাণীতে ডিম্বাশয়ে পরিণত হয়।

নিঃসরণ :

(ক) শুক্রাশয় থেকে নিঃসৃত হরমোন

(i) টেস্টোস্টেরন (Testosterone) : এ হরমোন আনুষঙ্গিক যৌন অঙ্গের বিকাশ এবং গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যসমূহের (দাড়ি, গোঁফ) প্রকাশ নিয়ন্ত্রণ করে। শুক্রাণু উৎপাদনে সহায়তা করে। লাল অস্থিমজ্জায় RBC উৎপাদনকে উদ্দীপিত করে।

(খ) ডিম্বাশয় থেকে নিঃসৃত হরমোন

(i) এস্ট্রোজেন (Oestrogen) : এ হরমোন স্ত্রী প্রাণীর গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্য বিকাশে সাহায্য করে।

(ii) প্রোজেস্টেরন (Progesterone) : মাসিক চক্র (menstrual cycle) সম্পূর্ণ করার জন্য এ হরমোন খুবই কার্যকর ভূমিকা রাখে। জরায়ুর গাত্রের পরিবর্তন ঘটিয়ে জাইগোটকে জরায়ুর সাথে সংবদ্ধনে সাহায্য করে। প্লাসেন্টা গঠনে সাহায্য করে।

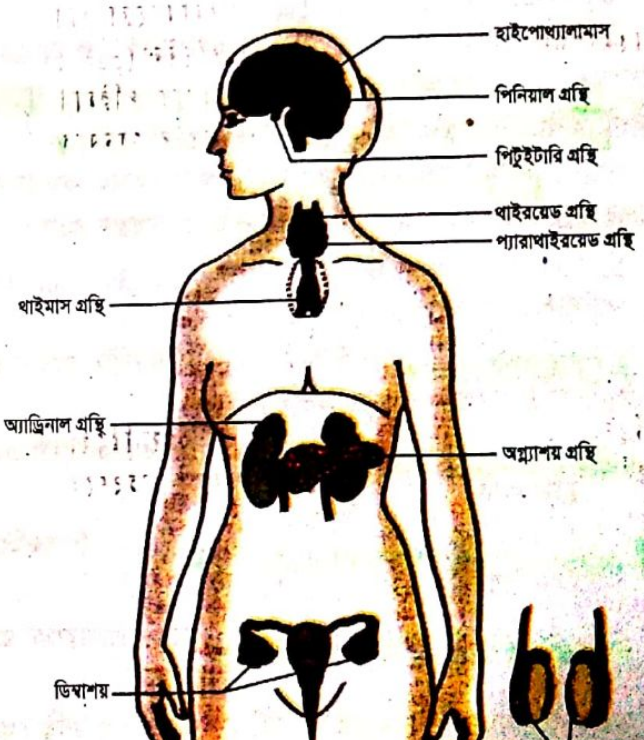

চিত্র ৮.২৩: মানবদেহের বিভিন্ন অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির অবস্থান

CamScanner

৭। অগ্ন্যাশয় (Pancreas)

অবস্থান : উদরের মধ্যে ডিওডেনামের দুটি অংশের মধ্যবর্তী অঞ্চলে ফ্যাকাসে বাদামি রঙের মিশ্র গ্রন্থিই অগ্ন্যাশয়। অগ্ন্যাশয়ের মধ্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কয়েক লাখ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঞ্জীভূত কোষগুচ্ছ বর্তমান, এদের **আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স** (Islets of Langerhans) বলে। আবিষ্কারক Langerhans (1869) এর নামানুসারে এরূপ নামকরণ করা হয়েছে। আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স অগ্ন্যাশয়ের মাত্রা ১-২% গঠন করে। এখানে আলফা (১০-১৫%), বিটা (৩০-৪০%), ডেল্টা (৫%) ও গামা (অল্প সংখ্যক) নামক কোষগুচ্ছ থাকে।

নিঃসরণ :

(ক) আলফা কোষ থেকে নিঃসৃত হরমোন

গ্লুকাগন (Glucagon) : এটি রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বাড়ায়। এছাড়াও পরিপাক রসের ক্ষরণ কমায়।

(খ) বিটা কোষ থেকে নিঃসৃত হরমোন

ইনসুলিন (Insulin) : এ হরমোন কার্বোহাইড্রেট বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে এবং রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ কমায়। যকৃৎ ও পেশির গ্লাইকোজেন সংশ্লেষণ হার বৃদ্ধি করে।

(গ) ডেল্টা কোষ থেকে নিঃসৃত হরমোন

সোমাটোস্টেটিন (Somatostatin) : গ্লুকাগন ও ইনসুলিন হরমোন নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ করে।

(ঘ) গামা কোষ বা PP কোষ থেকে নিঃসৃত হরমোন

- **প্যানক্রিয়েটিক পলিপেপটাইড** (Pancreatic polypeptide-PP) : পাকঅন্ত্রীয় ক্ষরণ বৃদ্ধি করে ও অগ্ন্যাশয়কে অগ্ন্যাশয় রস ক্ষরণে উদ্দীপিত করে। এছাড়াও এ হরমোন খাদ্য গ্রহণের পর নিঃসৃত হয়ে ক্ষুধা হ্রাস করে।

৮। পিনিয়াল গ্রন্থি (Pineal gland)

মস্তিষ্কের ডায়েনসেফালনের পৃষ্ঠীয়ভাগে এ গ্রন্থিটি অবস্থিত। এ গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হরমোন হলো **মেলাটোনিন** (melatonin)। এ হরমোন ঘুম নিয়ন্ত্রণ করে। এ জন্য একে **'ঘুম হরমোন'** বলে। এ হরমোন আলোক সূচক হিসেবে কাজ করে, তাই একে 'বায়োলজিক্যাল ঘড়ি' বলা হয়। কিছু প্রাণিদেহে এ হরমোন ত্বকের বর্ণ নিয়ন্ত্রণ করে। স্তন্যপায়ীদের ক্ষেত্রে এরা যৌন পরিণতির বাধাদায়ক হিসেবে কাজ করে। পিনিয়াল গ্রন্থি থেকে সামান্য **সেরোটোনিন** (serotonin) নিঃসৃত হয়।

৯। থাইমাস গ্রন্থি (Thymus gland)

ট্রাকিয়ার দুদিকে অর্থাৎ বক্ষদেশ ও হৃৎপিণ্ডের ঠিক উপরে থাইরয়েড গ্রন্থির নিম্নপ্রান্তে দুটি থাইমাস গ্রন্থি থাকে। শৈশবে এ গ্রন্থি আকারে বেশ বড় থাকলেও বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে ছোট হতে থাকে। এ গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হরমোন হলো **থাইমোসিন বা থাইমিন** (thymosin or thymin)।

কাজ : T-লিম্ফোসাইট উৎপন্ন করে; অনাক্রম্যতা ক্ষমতা বৃদ্ধি করে; অস্থিতে খনিজ পদার্থের সঞ্চয়ে সাহায্য করে এবং বয়ঃসন্ধিকাল পর্যন্ত যৌন গ্রন্থির বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

১০। গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি ও আন্ত্রিক গ্রন্থি (Gastric gland and Intestinal gland)

গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হরমোন–

গ্যাস্ট্রিন (Gastrin) : গ্যাস্ট্রিক রস এবং পাকস্থলীর প্রাচীর হতে HCl নিঃসরণ করে।

আন্ত্রিক গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হরমোন হলো–

(i) সিক্রেটিন (Secretin) : অগ্ন্যাশয় রসে বাইকার্বনেট মুক্ত করে, পিত্ত ক্ষরণ বৃদ্ধি করে এবং গ্যাস্ট্রিক রস ক্ষরণ হ্রাস করে।

(ii) কোলেসিস্টোকাইনিন (Cholecystokinin) : পিত্তথলিকে পিত্ত ক্ষরণে এবং অগ্ন্যাশয়কে অগ্ন্যাশয় রস ক্ষরণে উদ্দীপিত করে।

(iii) এন্টারোক্রিনিন (Enterocrinin) : অন্ত্রের প্রাচীরকে আন্ত্রিক রস নিঃসরণে উদ্দীপিত করে।

১১। অমরা (Placenta)

গর্ভকালীন সময়ে এই অস্থায়ী গ্রন্থিটি তৈরি হয়। এ গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হরমোন হলো–

(i) প্রোজেস্টেরন (Progesterone) : এ হরমোন স্তন গ্রন্থির বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে।

(ii) রিলাক্সিন (Relaxin) : এ হরমোন শ্রোণিচক্রের লিগামেন্ট প্রশমিত করে প্রসব সহজতর করার কাজে সাহায্য করে।

CS CamScanner

প্রধান অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলোর অবস্থান, নিঃসৃত হরমোন ও কাজ

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি	অংশ	নিঃসৃত হরমোন	প্রধান কাজ
১। পিটুইটারি গ্রন্থি [অবস্থান-মস্তিষ্ক]	ক. অগ্র পিটুইটারি	i. ফলিকল উদ্দীপক হরমোন (FSH) ii. লিউটিনাইজিং হরমোন (LH) iii. প্রোল্যাক্টিন বা লুটিওট্রপিক হরমোন (PRL/LTH) iv. থাইরয়েড উদ্দীপক হরমোন (TSH) v. অ্যাড্রিনাল উত্তেজক হরমোন (ACTH) vi. সোমাটোট্রপিন বা দেহ বৃদ্ধিকারক হরমোন (STH/ GH)	i. স্ত্রীদেহে ডিম্বথলির পরিণতি, ওভুলেশন, ইস্ট্রোজেন ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ; পুরুষদেহে শুক্রাশয়ে শুক্রাণুজনন ঘটায়। ii. স্ত্রীদেহে ডিম্বপাত, কর্পাস লিউটিয়াম তৈরিতে এবং ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরন উৎপাদন; সাহায্য করে। পুরুষদেহে এন্ড্রোজেন (টেস্টোস্টেরন) হরমোনের ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ। iii. নারীদেহে স্তনগ্রন্থির বিকাশ ও দুগ্ধক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ। পরিস্ফুটনের সময় নতুন রক্তকণিকা উৎপাদন। iv. থাইরক্সিন সংশ্লেষ ও থাইরয়েড গ্রন্থি কোষ কর্তৃক আয়োডিন গ্রহণ নিয়ন্ত্রণ। v. গ্লুকোকর্টিকয়েড ক্ষরণ ও মেলানোসাইট উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ। vi. দেহের বৃদ্ধি ঘটায়, বিশেষ করে অস্থি ও পেশির বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ।
	খ. পশ্চাৎ পিটুইটারি	i. অক্সিটোসিন ii. অ্যান্টিডাই-ইউরেটিক হরমোন (ADH)	i. জরায়ু-সংকোচন ও দুগ্ধক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করা। ii. রক্তচাপ বৃদ্ধি করা; পানির সমতা বজায় রাখা; বৃক্কের পানি শোষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে মূত্রের উৎপাদন হ্রাস করা; মূত্রে পানির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ এবং বিভিন্ন অনৈচ্ছিক পেশির সংকোচন ঘটাতে উদ্বুদ্ধ করা।
২। থাইরয়েড গ্রন্থি [অবস্থান-শ্বাসনালি]		i. ট্রাইআয়োডোথাইরোনিন (T_3) ii. থাইরক্সিন (T_4) iii. থাইরোক্যালসিটোনিন (TCT)	i. বিপাক হার, হৃৎস্পন্দন, প্রোটিন সংশ্লেষ ও স্নায়ুতন্ত্রের সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ। ii. দৈহিক ও মানসিক বৃদ্ধি ও যৌন লক্ষণ প্রকাশে সাহায্য করে। বিভিন্ন পদার্থের (আয়োডিন, প্রোটিন ও শর্করা) বিপাকীয় হারকে নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়াও হৃৎক্রিয়া ও দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি করে। iii. রক্তে ক্যালসিয়ামের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ এবং দেহে ফসফেটের বিপাক ও পরিবহনে সহায়তা কর।
৩। প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি [অবস্থান-থাইরয়েডের পৃষ্ঠদেশে]		প্যারাথরমোন বা প্যারাথাইরয়েড হরমোন (PTH)	ক্যালসিয়াম ও ফসফেটের বিপাক নিয়ন্ত্রণ।
৪। থাইমাস গ্রন্থি [অবস্থান-শ্বাসনালির নিচে]		থাইমোসিন বা থাইমিন	T-লিম্ফোসাইট সৃষ্টি এবং অনাক্রম্যতা ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
৫। আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স [অবস্থান-অগ্ন্যাশয়]		i. গ্লুকাগন ii. ইনসুলিন ii. সোমাটোস্টেটিন	i. রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বাড়ানো, গ্লাইকোজেনোলাইসিসে সহায়তা এবং পরিপাক রসের ক্ষরণ কমানো। ii. রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ কমানো এবং যকৃৎ ও পেশির গ্লাইকোজেন সংশ্লেষণ হার বৃদ্ধি করা। iii. ইনসুলিন ও গ্লুকাগন হরমোন নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ করা।
৬। এড্রেনাল বা সুপ্রারেনাল গ্রন্থি [অবস্থান-প্রতিটি বৃক্কের ঊর্ধ্ব প্রান্তে]	ক. কর্টেক্স	i. গ্লুকোকর্টিকয়েড ii. মিনারেলোকর্টিকয়েড iii. যৌন হরমোন	i. শর্করা ও আমিষ বিপাক নিয়ন্ত্রণ এবং অ্যান্টিবডি উৎপাদন হ্রাস করা । ii. খনিজ লবণের বিপাক নিয়ন্ত্রণ, পটাশিয়াম ও ফসফেট নির্গমন এবং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ। iii. যৌনাঙ্গের বর্ধন ও যৌন লক্ষণ প্রকাশ করা।
	খ. মেডুলা	i. এড্রেনালিন ii. নর-এড্রেনালিন	i. যকৃতের গ্লাইকোজেন থেকে গ্লুকোজ অবমুক্ত করে বিপাকের হার নিয়ন্ত্রণ; হৃৎস্পন্দন হার, রক্তচাপ, শ্বাসক্রিয়া ইত্যাদি বৃদ্ধি; দেহের উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ এবং ভয়, আনন্দ ও শোক প্রকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখা। ii. রক্তচাপ ও হৃৎস্পন্দন বৃদ্ধি, হৃৎপেশি উদ্দীপ্ত করা, রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়, দেহের অতিরিক্ত গ্লুকোজ গ্লাইকোজেনে রূপান্তরিত করা এবং রক্তনালিকার ও রেচননালিকার সংকোচন ঘটানো।

CamScanner

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি	অংশ	নিঃসৃত হরমোন	প্রধান কাজ
৭। পিনিয়াল গ্রন্থি [অবস্থান-মস্তিষ্কের ডায়েনসেফালনের পৃষ্ঠীয়ভাগে অর্থাৎ ৩য় ভেন্ট্রিকলে]		মেলাটোনিন	ঘুম নিয়ন্ত্রণ করা, ফসফরাস বিপাক দ্রুত করা, আলোক সূচক হিসেবে কাজ করা। ত্বকের বর্ণ নিয়ন্ত্রণ এবং যৌন অঙ্গের সক্রিয়তা ঘটানো।
৮। শুক্রাশয় [অবস্থান : পূর্ণাঙ্গ পুরুষদেহের স্ক্রোটামে]		অ্যান্ড্রোজেন (টেস্টোস্টেরন)	পুরুষদেহে আনুষঙ্গিক যৌন অঙ্গের বিকাশ এবং গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যসমূহের (দাড়ি, গোঁফ) প্রকাশ নিয়ন্ত্রণ করা এবং শুক্রাণু উৎপাদন ক্রিয়া অব্যাহত রাখা।
৯। ডিম্বাশয় [অবস্থান-স্ত্রীদেহের শ্রোণিগহ্বরের পৃষ্ঠপ্রাচীরের গায়ে জরায়ুর দু'পাশে]		i. এস্ট্রোজেন ii. প্রোজেস্টেরন	i. বয়ঃসন্ধিকালে স্ত্রীদেহের বিভিন্ন গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্য বিকাশে সাহায্য করা। ii. স্ত্রীদেহে ঋতুচক্র নিয়ন্ত্রণ এবং গর্ভাবস্থায় জরায়ু, ভ্রূণ, প্লাসেন্টা ইত্যাদির বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ।

অন্তঃক্ষরা ও বহিঃক্ষরা গ্রন্থির মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি	বহিঃক্ষরা গ্রন্থি
১। সংজ্ঞা	যেসব গ্রন্থির নিজস্ব কোনো নালি নেই, তাদের অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি বলে।	যেসব গ্রন্থির নিজস্ব নালি আছে তাদের বহিঃক্ষরা গ্রন্থি বলে।
২। নিঃসৃত রসের নাম	হরমোন	এনজাইম, ঘাম, দুগ্ধ, অশ্রু ইত্যাদি
৩। ক্ষরিত বস্তুর বাহকের মাধ্যম	সরাসরি রক্ত বা লসিকার মাধ্যমে পরিবাহিত হয়।	নির্দিষ্ট নালি পথে বাহিত হয়।
৪। ক্ষরিত বস্তুর ক্রিয়া	ক্ষরণ স্থান থেকে দূরবর্তী টার্গেট অঙ্গে ক্রিয়া করে।	সাধারণত ক্ষরণ স্থানের কাছাকাছি ক্রিয়া করে। তবে দূরবর্তী টার্গেট অঙ্গেও ক্রিয়া করে।
৫। উদাহরণ	পিটুইটারি গ্রন্থি, থাইরয়েড, অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি ইত্যাদি।	লালাগ্রন্থি, যকৃৎ, ঘর্মগ্রন্থি, স্তনগ্রন্থি, অশ্রুগ্রন্থি ইত্যাদি।

হরমোন ও এনজাইমের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	হরমোন	এনজাইম
১। উৎপত্তিস্থল	অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে।	বহিঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে।
২। পরিবাহিত হওয়ার মাধ্যম	রক্ত বা লসিকার মাধ্যমে বাহিত হয়।	নিজস্ব নালিপথে বাহিত হয়।
৩। ক্রিয়ার প্রকৃতি	রাসায়নিক বিক্রিয়ায় সরাসরি অংশ নেয় না এবং কাজের শেষে বিনষ্ট হয় বা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় দেহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়।	রাসায়নিক বিক্রিয়ায় প্রত্যক্ষ অংশ নেয় এবং অনুঘটকের মতো বিক্রিয়া শেষে অপরিবর্তিত থাকে।
৪। কার্যপদ্ধতি	ধীর গতিসম্পন্ন, দীর্ঘস্থায়ী এবং ফল সুদূরপ্রসারী।	দ্রুত ও ফল তাৎক্ষণিক।
৫। ক্রিয়াস্থল	উৎপত্তিস্থল থেকে দূরবর্তী অংশ কার্যক্ষম।	সাধারণত উৎপত্তিস্থলের নিকটবর্তী কোনো স্থানে সক্রিয়।
৬। রাসায়নিক প্রকৃতি	প্রোটিনধর্মী তবে স্টেরয়েড বা ফেনলিক হতে পারে।	সকল এনজাইমই প্রোটিনধর্মী।
৭। বয়সের সাথে ভিন্নতা	বিভিন্ন বয়সে বা জীবনের বিভিন্ন দশায় হরমোনের ভিন্নতা দেখা যায়।	সব বয়সে একই রকম এনজাইম দেখা যায়।
৮। উদাহরণ	থাইরক্সিন, ইনসুলিন, গ্যাস্ট্রিন ইত্যাদি	পেপসিন, অ্যামাইলেজ, লাইপেজ ইত্যাদি

৮.৬ হরমোনের প্রভাব ও অনিয়ন্ত্রিত হরমোনের ব্যবহার
(Effects of Hormone and it's uncontrolled uses)

যেসব জৈব রাসায়নিক পদার্থ (প্রোটিনধর্মী বা ফেনলিক বা স্টেরয়েড হতে পারে) অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয়ে রক্ত বা লসিকার মাধ্যমে বাহিত হয় এবং সাধারণত উৎপত্তিস্থল থেকে দূরবর্তী বিভিন্ন অঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে এবং দেহের নানাবিধ বিপাকীয় ক্রিয়া শেষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তাকে হরমোন (hormone) বলে। সংক্ষেপে, অন্তঃক্ষরা

CS CamScanner

গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত পদার্থই হলো **হরমোন**। বিজ্ঞানী **বেলিস** (Bayliss) এবং **স্টারলিং** (Starling) 1904 সালে সর্বপ্রথম হরমোন শব্দটি ব্যবহার করেন। Hormone শব্দটি গ্রিক শব্দ *hormao* থেকে উৎপত্তি হয়েছে, যার অর্থ হলো **'উত্তেজিত করা'** (to excite) বা **'জাগ্রত করা'**। এর প্রথমে বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে, সব হরমোনই উত্তেজক পদার্থ কিন্তু পরবর্তীতে জানা গেছে, সব হরমোনই **উত্তেজক** বা **উদ্দীপক** (stimulator) নয়। কোনো কোনো **হরমোন** বাধাদানকারী বা **প্রতিবন্ধক** (inhibitor) হিসেবেও কাজ করে। আবার কোনো কোনো হরমোন দেহের এক অংশের উদ্দীপনা জোগায় এবং অপর অংশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

হরমোনের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Hormone)

১। হরমোন সাধারণত অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে উৎপন্ন হয়।

২। হরমোন জৈব যৌগ বিশেষ যা একটি অঙ্গের অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয়ে রক্ত বা লসিকার মাধ্যমে দূরবর্তী কোনো অঞ্চলের কোষসমূহের কার্যকারিতাকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

৩। বেশির ভাগ হরমোনই পানিতে দ্রবণীয় বলে রক্ত বা লসিকার মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন স্থানে বাহিত হয়।

৪। বিভিন্ন হরমোনের রাসায়নিক প্রকৃতিতে বৈচিত্র্য দেখা যায়। এরা প্রাকৃতিক প্রোটিন বা পেপটাইড বা গ্লাইকোপ্রোটিন বা স্টেরয়েড বা একটি বা দুটি অ্যামিনো এসিড ঘটিত জৈব পদার্থ।

৫। হরমোন অত্যন্ত স্বল্পমাত্রায় কার্যক্ষম কিন্তু এই ক্রিয়ার কার্যকাল দীর্ঘদিন পর্যন্ত বজায় থাকে।

৬। ক্ষরণকারী গ্রন্থি ছাড়া হরমোন কখনই দেহের মধ্যে সঞ্চিত থাকে না।

৭। হরমোনের নির্দিষ্ট কাজসম্পন্ন হওয়ার পর এরা বিনষ্ট হয়ে যায় এবং রেচন প্রক্রিয়ার সাহায্যে দেহ থেকে বের হয়ে যায়।

৮। কয়েকটি হরমোন প্রাণিদেহে দ্বৈত নিয়ন্ত্রণের ভূমিকা রাখে। রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা, দেহের বৃদ্ধি ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণে একাধিক হরমোন অংশগ্রহণ করে।

৯। হরমোনের ক্রিয়াকলাপ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভিটামিনের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে।

১০। স্নায়ুতন্ত্রের সাথে সম্পর্ক রেখে হরমোন বিভিন্ন দৈহিক ও শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

১১। হরমোন বিভিন্ন কোষে রাসায়নিক বার্তা প্রেরণ করে থাকে, তাই হরমোনকে **রাসায়নিক দূত** (chemical messenger) বলে।

১২। হরমোন সাধারণত ক্ষুদ্রতর অণু, তাই সহজেই এরা কোষঝিল্লি বা রক্তনালির অন্তঃস্থ আবরণী কলার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে পারে।

দেহের বৃদ্ধিতে হরমোনের প্রভাব (Effect of hormone in the growth of the body)

মানবদেহের বৃদ্ধিতে সাধারণত দু'ধরনের হরমোন প্রভাব বিস্তার করে থাকে। হরমোন দুটি হলো পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত **গ্রোথ হরমোন** (Growth Hormone-GH) ও থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত **থাইরক্সিন হরমোন** (Thyroxine Hormone-TH or T4 Hormone)। এছাড়াও আরও কয়েকটি হরমোন দেহের বৃদ্ধিতে অংশগ্রহণ করে থাকে। দৈহিক বৃদ্ধিতে হরমোনগুলোর কাজ নিম্নরূপ–

(ক) দৈহিক বৃদ্ধিতে গ্রোথ হরমোনের প্রভাব : মানুষের আকার, আয়তন, উচ্চতা, ওজন ইত্যাদি বৃদ্ধিতে এই হরমোনের ভূমিকা অপরিসীম তাই একে **গ্রোথ হরমোন** বলা হয়। গ্রোথ হরমোনের প্রভাবে দেহের বিভিন্ন অংশের বৃদ্ধিজনিত কার্যাবলি নিম্নরূপ–

১। **পেশির বৃদ্ধি :** গ্রোথ হরমোনের প্রভাবে প্রোটিন পরিপাকের ফলে সৃষ্ট সরল ও তরল অ্যামাইনো এসিড কোষে গৃহীত হয় ও এদের গ্রহণ মাত্রা বৃদ্ধি পায়। এর ফলে কোষে প্রোটিন সংশ্লেষণ হার বৃদ্ধি পায় ও পেশির বৃদ্ধি সাধন ঘটে।

২। **পেশির ক্ষয়রোধ :** সাধারণত ক্ষুধার্ত অবস্থায় রক্তে গ্লুকোজ ও ফ্যাটি এসিডের পরিমাণ কমে যায়। এ অবস্থায় গ্রোথ হরমোনের প্রভাবে রক্তে গ্লুকোজ ও ফ্যাটি এসিডের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় দেহের ক্ষয়রোধ হয়।

৩। **কঙ্কালতন্ত্রের বৃদ্ধি :** কোমলাস্থির আয়তন বৃদ্ধি, অস্টিওব্লাস্টের অস্টিওসাইটের পূর্ণতা প্রাপ্তি, অস্থিতে ক্যালসিয়াম আয়ন সঞ্চয় ইত্যাদি সব কার্যক্রম এই হরমোন দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়।

৪। **আয়ন বৃদ্ধি :** গ্রোথ হরমানের প্রভাবে খাদ্যবস্তু থেকে সৃষ্ট বিভিন্ন আয়ন বিশেষ করে ক্যালসিয়াম আয়ন পরিপাক নালি থেকে শোষিত হয় এবং বৃক্ক থেকে বিভিন্ন আয়ন শোষণের মাধ্যমে দেহে আয়ন বৃদ্ধি করে। এসব আয়ন দৈহিক বৃদ্ধির জন্য অত্যাবশ্যক।

CS CamScanner

৫। দুগ্ধ উৎপাদন : গ্রোথ হরমোন স্তনগ্রন্থিকে অধিক দুগ্ধ উৎপাদনে প্রভাবিত করে ফলে শিশু দুগ্ধ পান করে দৈহিকভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

৬। লোহিত কণিকা সৃষ্টি : এই হরমোন এরিথ্রোপোয়েসিস (erythropoesis) প্রক্রিয়াকে উদ্দীপিত করে রক্তে লোহিত রক্তকণিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করে। লোহিত কণিকা O_2 পরিবহন করে। বিপাক ক্রিয়ার হার বৃদ্ধি করে দেহ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

শিশুকালে গ্রোথ হরমোন কম ক্ষরিত হলে মানুষ বামন (dwarf) হয়। কিন্তু শিশুকালে অতিরিক্ত গ্রোথ হরমোন ক্ষরণের কারণে মানুষের আকার দৈত্যের (gaint) মতো ধারণ করে এবং বয়স্কদের অতিরিক্ত পরিমাণ গ্রোথ হরমোন ক্ষরিত হলে হাত ও মুখমণ্ডলের অস্থি অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে গরিলার (acromegaly) মতো চেহারা হয়।

(খ) দৈহিক বৃদ্ধিতে থাইরক্সিন হরমোনের প্রভাব : থাইরয়েড গ্রন্থি নিঃসৃত **থাইরক্সিন হরমোন** মানবদেহের দৈহিক বৃদ্ধিতে নিম্নলিখিতভাবে প্রভাব বিস্তার করে।

১। পিটুইটারি গ্রন্থিকে প্রভাবিত করে : থাইরক্সিন হরমোন পিটুইটারি গ্রন্থিকে গ্রোথ হরমোন ক্ষরণে উদ্দীপিত করে।

২। গাঠনিক প্রোটিন সংশ্লেষণ : এই হরমোন দেহের গাঠনিক প্রোটিন সংশ্লেষের হার বৃদ্ধি করে থাকে যার ফলে দেহের বৃদ্ধি সাধন হয়।

৩। কলার বিভেদন : এ হরমোন বিভিন্ন কলার বিভেদন ও পরিপক্বতায় কার্যকর ভূমিকা পালন করে। এর অভাবে অস্থির অসিফিকেশন ঘটে না ফলে দেহের বিকাশ ও বৃদ্ধি হয় না।

৪। খাদ্যের বিপাকীয় হার বৃদ্ধি : থাইরক্সিন হরমোন খাদ্যের বিপাকের হার বৃদ্ধি করে ফলে দেহের বৃদ্ধি ঘটে।

৫। পেশির বৃদ্ধি ও রক্ষণাবেক্ষণ : এই হরমোন কঙ্কাল পেশির বৃদ্ধি ও রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ন্ত্রণ করে।

৬। দুগ্ধ উৎপাদন : এই হরমোন মাতৃদুগ্ধ উৎপাদন ও পৌষ্টিকতন্ত্রের স্বাভাবিক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে যা পরোক্ষভাবে দেহের বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে।

থাইরক্সিন হরমোনের অতিরিক্ত ক্ষরণ ও অল্পমাত্রায় ক্ষারণ উভয়ই মানবদেহের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এ হরমোন অতিরিক্ত ক্ষরণের ফলে **গলগণ্ড** বা **গয়টার** (goitre) রোগ হয় এবং কম ক্ষরণে শিশুদের **ক্রিটিনিজম** (cretinism) ও বয়স্কদের **মিক্সোডেমা** (myxodema) নামক রোগ হয়।

(গ) দৈহিক বৃদ্ধিতে অন্যান্য হরমোনের প্রভাব : মানবদেহের বৃদ্ধিতে গ্রোথ ও থাইরক্সিন হরমোন ছাড়াও অন্যান্য হরমোনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব লক্ষ করা যায়। যেমন–

১। ইনসুলিন হরমোন : এই হরমোন রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ কমায় এবং গ্লাইকোজেন আকারে যকৃতে ও পেশিতে জমা রাখতে সাহায্য করে যা বিপাকীয় ক্রিয়ায় তাপশক্তিতে পরিণত হয়ে দৈহিক বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে।

২। কর্টিকোস্টেরয়েড হরমোন : কর্টিকোস্টেরয়েড হরমোন শর্করা, চর্বি ও প্রোটিন জাতীয় খাদ্য বিপাকে প্রভাব বিস্তার করে। যা দেহ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৩। প্রোল্যাকটিন হরমোন : প্রোল্যাকটিন হরমোনের প্রভাবে স্তনগ্রন্থির বিকাশ ঘটে ও দুগ্ধক্ষরণ হয়, ফলে শিশুদের দেহ বৃদ্ধির সহায়তা করে।

৪। সেক্স স্টেরয়েড হরমোন : এই হরমোনের প্রভাবে আনুষঙ্গিক যৌন বৈশিষ্ট্য ও গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্য বিকশিত হয়।

এছাড়াও গ্রোথরিলিজিং হরমোন, ক্যালসিটোনিন, গ্লুকোকর্টিকয়েড ইত্যাদি হরমোনও দৈহিক বৃদ্ধিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করে।

শারীরবৃত্তিক কাজে হরমোনের ভূমিকা (Effect of Hormone in the Metabolic work)

বিভিন্ন অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত ও রক্তে বাহিত হরমোন অতি অল্প পরিমাণেই বিশেষ বিশেষ শারীরবৃত্তিক কাজ বা পদ্ধতিকে সূক্ষ্মভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। শারীরবৃত্তিক কাজে হরমোনের ভূমিকা নিম্নরূপ–

১। খাদ্য পরিপাকে : গ্যাসট্রিন, সিক্রেটিন, কোলেসিস্টোকাইনিন, ভিল্লিকাইনিন, এন্টারোগ্যাস্ট্রান নামক হরমোন পরিপাকনালির অন্তঃক্ষরাধর্মী কোষ থেকে ক্ষরিত হয়ে পরিপাকে অংশ নিয়ে বিভিন্ন এনজাইমের ক্ষরণ উদ্দীপিত করে এবং ভিলাইকে সবল করে শোষণ ক্ষমতা বাড়ায়।

২। বিপাক নিয়ন্ত্রণে : থাইরক্সিন, ইনসুলিন, গ্লুকাগন, গ্লুকোকর্টিকয়েড হরমোন শর্করা বিপাক; থাইরক্সিন হরমোন প্রোটিন, ফ্যাট ও খনিজ আয়ন বিপাক; টেস্টোস্টেরন ও ইস্ট্রোজেন হরমোন প্রোটিন বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে।

CamScanner

৩। প্রোটিন সংশ্লেষ ও সঞ্চয়ে : স্টেরয়েডধর্মী টেস্টোস্টেরন, প্রোজেস্টেরন ও ইস্ট্রোজেন হরমোন; আয়োডিনধর্মী থাইরক্সিন হরমোন জিন সক্রিয়করণের মাধ্যমে প্রোটিন সংশ্লেষণের হার বৃদ্ধি করে। বৃদ্ধি হরমোন 'প্রোটিন বাঁচোয়া প্রক্রিয়া'র (Protein Sparing Action) মাধ্যমে ফ্যাটকে ভেঙে শক্তি উৎপাদন উদ্বুদ্ধ করে। হরমোন DNA এবং RNA-কেও নিয়ন্ত্রিত করে প্রোটিন সংশ্লেষণের মাধ্যমে বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজ নিয়ন্ত্রণ করে।

৪। আয়ন সমতা রক্ষায় : অ্যাড্রেনাল কর্টেক্স থেকে ক্ষরিত অ্যালডোস্টেরন Na^+, K^+ আয়ন সমতা রক্ষা করে এবং প্যারাথরমোন ও ক্যালসিটোনিন বৃক্কের Ca^{++} শোষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

৫। পানিসাম্য নিয়ন্ত্রণে : গ্লুকোকর্টিকয়েড, ভেসোপ্রেসিন বৃক্ককে অতিরিক্ত পানি শোষণে উদ্দীপিত করে। ফলে দেহের পানি সাম্যতা নিয়ন্ত্রণ করে।

৬। লোহিত রক্তকণিকা উৎপাদন : বৃক্ক থেকে ক্ষরিত এরিথ্রোপোয়েটিন লোহিত রক্তকণিকা উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে।

৭। স্নায়বিক উত্তেজনা প্রেরণে : অ্যাসিটাইল কোলিনের মতো অ্যাড্রেনালিন ও নর-অ্যাড্রেনালিন হরমোন স্নায়বিক উত্তেজনা প্রেরণে সাহায্য করে।

৮। আপদকালীন অবস্থা নিয়ন্ত্রণে : অ্যাড্রেনাল গ্রন্থির মেডুলা থেকে ক্ষরিত অ্যাড্রেনালিন ও নর-অ্যাড্রেনালিন হরমোন রক্তনালির সংকোচন-প্রসারণ ঘটিয়ে ঘাম নিঃসরণ বৃদ্ধি করে দেহকে আপদকালীন অবস্থা থেকে রক্ষা করে।

৯। প্রজননে : পুরুষ ও স্ত্রী জননাঙ্গ থেকে ক্ষরিত যথাক্রমে টেস্টোস্টেরন ও ইস্ট্রোজেন হরমোন জননকোষ উৎপাদনে ও পরিণতি প্রাপ্তিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে; শুক্রাণুজননে শুক্রাশয়কে উদ্বুদ্ধ করে এবং স্ত্রীলোকের প্রোজেস্টেরন হরমোন গর্ভাবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে।

১০। বয়ঃসন্ধি : টেস্টোস্টেরন, ইস্ট্রোজেন ও গোনাডোকর্টিকয়েড গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটায়।

১১। দুগ্ধক্ষরণে : ইস্ট্রোজেন, প্রোল্যাকটিন, গ্রোথ হরমোন ইত্যাদি স্তন্যগ্রন্থির বৃদ্ধি ও দুগ্ধক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে।

১২। সন্তান প্রসবে : পশ্চাৎ পিটুইটারি থেকে ক্ষরিত অক্সিটোসিন জরায়ু-পেশির সংকোচন ঘটিয়ে এবং রিলাক্সিন শ্রোণিদেশীয় লিগামেন্ট ও পেশির প্রসারণ ঘটিয়ে প্রসূতির সন্তান প্রসবে সাহায্য করে।

১৩। দেহের বর্ণ নিয়ন্ত্রণে : মেলানোসাইট স্টিমুলেটিং হরমোন মেলানোসাইটের পিগমেন্ট সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে গায়ের বর্ণ নিয়ন্ত্রণ করে।

১৪। রোগ প্রতিরোধ : থাইমোসিন লিম্ফোসাইটের উপর ক্রিয়াশীল হয়ে দেহে অনাক্রম্যতা সৃষ্টি করে।

❑ **কাজ :** (i) অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি দেহের শারীরবৃত্তীয় কাজে অংশগ্রহণ করে-আলোচনা কর।

মানুষের আচরণের ওপর হরমোনের প্রভাব (Effect of Hormone in Human Behavior)

মানুষের আচরণ অত্যন্ত জটিল প্রকৃতির। বিভিন্ন ধরনের যেসব ফ্যাক্টর দ্বারা এসব আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয় হরমোন তার মধ্যে অন্যতম। মানুষের আচরণের ওপর বংশগতি ও হরমোনের প্রভাব নিয়ে বহু বছর ধরে ব্যাপকভাবে গবেষণা চলছে। আচরণের ওপর হরমোনের প্রভাবে অনেক বেশি, অনেক মতবাদ দ্বারা তা প্রমাণিত হয়েছে। মানুষের রাগ, অনুরাগ, সতর্কতা, উদ্যমতা, বিষণ্ণতা, দুশ্চিন্তা, অনিদ্রা, আগ্রাসন প্রভৃতি আচরণ হরমোন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

মানুষের আচরণের ওপর বিভিন্ন হরমোনের প্রভাব নিম্নরূপ−

১। থাইরক্সিন (Thyroxin) : অতিমাত্রায় থাইরক্সিন ক্ষরিত হলে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়, মনোযোগ কমে যায়, কাজের প্রতি আগ্রহ থাকে না, অনিদ্রা, ক্লান্তি, উৎকণ্ঠা ইত্যাদি বৃদ্ধি পায়।

২। প্যারাথরমোন (Parathormone) : এই হরমোন প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি ক্ষরিত হয় যা উত্তেজনার মাত্রাকে প্রভাবিত করে।

৩। অ্যাডরেনালিন/এপিনেফ্রিন (Adrenalin/ Epinephrine) : অ্যাডরেনাল গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত এই হরমোন ভয়, ক্রোধ, আতঙ্ক, আনন্দ প্রকাশে ভূমিকা রাখে। এছাড়াও মানুষের স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব গঠনে এই হরমোন বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

৪। নর-অ্যাডরেনালিন/নর-এপিনেফ্রিন (Nor adrenalin/ Nor epinephrine) : অ্যাডরেনাল গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত এই হরমোন মানুষের মানসিক চাপ, আক্রমণ, পলায়ন আচরণ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে।

৫। মেলাটোনিন (Melatonin) : মস্তিষ্কের পিনিয়াল গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত এই হরমোন মানুষের ঘুম, জাগ্রত আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। এই হরমোনের ক্ষরণ কম হলে মানুষ অনিদ্রায় ভোগে।

CamScanner

৬। **টেস্টোস্টেরন** (Testosteron) : শুক্রাশয় থেকে অতিমাত্রায় এই হরমোন ক্ষরণের ফলে মানুষের স্বভাবে উগ্রতা সৃষ্টি হয়। যৌন আকাঙ্ক্ষা বেড়ে যায়। এছাড়া পুরুষে কাজের নৈপুণ্য, কথা বলার দক্ষতা, অনুধাবন ক্ষমতা, পুরুষালি আচরণ ইত্যাদি এ হরমোন ক্ষরণের ফলে হয়ে থাকে। সাধারণত পুরুষে ৪০ বছর বয়স থেকে টেস্টোস্টেরন ক্ষরণ ক্রমশ কমে আসে। ফলে যৌন তাড়না কমে যায়, অবসাদগ্রস্ত ও বিষণ্নতা দেখা দেয়।

৭। **ইস্ট্রোজেন** (Estrogene) ও **প্রোজেস্টেরন** (Progesteron) : এই ধরনের হরমোন ডিম্বাশয় থেকে কম মাত্রায় ক্ষরিত হলে নারীরা অল্প কিছুতে রেগে যায়, ঘুম ঠিকমতো হয় না, বিষণ্নতায় ভোগে। সন্তান প্রসবের পর এসব হরমোনের ক্ষরণের তারতম্য ঘটলে নারীরা নানান মানসিক রোগে ভোগেন একে **প্রসবোত্তর সাইকোসিস** বলে। এছাড়াও নারীদের কাজের নৈপুণ্যতা, কথা বলায় দক্ষতা ও অনুধাবন ক্ষমতা ইস্ট্রোজেন হরমোন ক্ষরণের সঙ্গে জড়িত।

৮। **অন্যান্য হরমোন** (Other hormones) : পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত বিভিন্ন হরমোন অন্যান্য সব হরমোনের ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে বলে এ গ্রন্থি ক্ষরিত হরমোনগুলো মানুষের সব ধরনের আচরণের সঙ্গে জড়িত। এ গ্রন্থি থেকে অ্যাডরেনাল, কর্টিকো ট্রফিক হরমোন ক্ষরণের জন্য মানুষের দৈহিক ও মানসিক স্বাভাবিক বিকাশ ঘটে থাকে।

অনিয়ন্ত্রিত হরমোনের ব্যবহারের ফলাফল (Result of uncontrolled use of Hormone)

হরমোন হচ্ছে শক্তিশালী রাসায়নিক পদার্থ যা আমাদের দেহের স্বাভাবিক কাজকর্ম বজায় রাখতে সহায়তা করে। মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপন ও দৈহিক বৃদ্ধিতে হরমোনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হরমোনের সঠিক মাত্রার উপস্থিতি এসব নিয়ন্ত্রণ করে। বয়সকালে কিছু হরমোন ক্ষরণের মাত্রা কমতে থাকে অথবা দেহ পর্যাপ্ত হরমোন উৎপাদনে অক্ষম হয়ে পড়ে। ফলে নানা জটিলতা দেখা দেয় ও জীবন দুর্বিষহ হতে পারে। সেসব ক্ষেত্রে বাইরে থেকে হরমোন প্রয়োগ করে চিকিৎসা করা হয়। চিকিৎসার উদ্দেশ্যে হরমোন ব্যবহারে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কারণ হরমোনের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারে শারীরবৃত্তীয় কার্যক্রম বিঘ্নিত হয় বিভিন্ন ধরনের রোগ ও শারীরিক মারাত্মক সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। কয়েকটি হরমোনের অনিয়ন্ত্রিত ফলাফল নিম্নরূপ–

১। **বৃদ্ধি হরমোন** (Growth hormone) : মানুষের উচ্চতা ও ওজন বৃদ্ধিতে বৃদ্ধি হরমোন ভূমিকা রাখে। মানুষের বৃদ্ধিজনিত অধিকাংশ শারীরবৃত্তীয় কার্যকলাপ এ হরমোন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। দেহকে স্থিতিশীল ও সঠিক বৃদ্ধির মাত্রা বজায় রাখতে গিয়ে অতিরিক্ত বৃদ্ধি হরমোন ব্যবহারের ফলে উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, গেঁটে বাত, হার্টফেইলিউর, অস্থি ও পেশির রোগ দেখা দিতে পারে।

২। **থাইরক্সিন** (Thyroxin) : থাইরক্সিন হরমোনের ক্ষরণ কম হলে গলগণ্ড, থাইরয়েডের ক্যান্সার ইত্যাদি রোগ হয়। এসব রোগ প্রতিরোধ করতে থাইরক্সিন হরমোন অতিমাত্রায় ব্যবহার করলে দেহে অনেক জটিলতা সৃষ্টি হয়। যেমন– ছদ্ম গলগণ্ড, হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়, পেটে ব্যথা হয়, মেজাজ খিটখিটে হয়, চিন্তাগ্রস্ত হয়, ওজন কমে যায়, ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়। হার্টফেইলিউর ও রক্তে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের মাত্রার অস্বাভাবিক পরিবর্তন ঘটতে পারে। এছাড়াও অ্যালার্জিজনিত প্রতিক্রিয়ায় শ্বাসকষ্ট, মুখমণ্ডল ও জিহ্বা ফুলে যায়।

৩। **ইনসুলিন** (Insuline) : ডায়াবেটিস রোগীরা স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অব্যাহত রাখতে ইনজেকশনের মাধ্যমে ইনসুলিন নিয়ে থাকেন। কিন্তু ইনসুলিন গ্রহণের মাত্রা নিয়ন্ত্রিত না হলে অনেক জটিলতায় ভুগতে হয়। যেমন– বমিভাব, মাথাব্যথা, খিঁচুনি, অবসাদ দেখা দেয়, ঘুম ঘুম ভাব, স্নায়ু দুর্বলতা, ত্বক ফ্যাকাসে হওয়া, হৃৎস্পন্দন বেড়ে যাওয়া ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়।

৪। **অ্যাডরেনালিন/ এপিনেফ্রিন** (Adrenalin/Epineprine) : বায়ু চলাচলের জন্য শ্বাসনালি খুলতে, রক্তনালি সংকীর্ণ করতে এবং বিভিন্ন রকম মারাত্মক অ্যালার্জিজনিত ক্রিয়ার বিরুদ্ধে কাজ করতে অ্যাডরেনালিন/এপিনেফ্রিন হরমোন ব্যবহার করা হয়। অতিমাত্রায় এই হরমোন ব্যবহার করলে রক্তচাপ বেড়ে যায়। মাথা ব্যথা, বুক ব্যথা, অনিয়মিত হৃৎস্পন্দন, দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যাওয়া, দুশ্চিন্তা, শরীর দুর্বল হওয়া, হাঁটা চলা ও কথা বলায় ভারসাম্যহীনতা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়।

৫। **টেস্টোস্টেরন** (Testosteron) : টেস্টোস্টেরন হরমোন পুরুষের যৌনাঙ্গকে সুগঠিত রাখে, গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যে প্রকাশ ঘটিয়ে পৌরুষ প্রদর্শন করে। টেস্টোস্টেরন হরমোন ক্ষরণ কম হলে এর অভাব পূরণ করতে টেস্টোস্টেরনবাহী বড়ি বা ইনজেকশন ব্যবহার করা হয়। এর অতিমাত্রায় ব্যবহারের কারণে শরীর দুর্বল হয়। ঘুম ঘুম ভাব, গায়ে ব্যথা, ত্বকে জ্বালাপোড়া করা, হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসা, অমনোযোগিতা, শুক্রাশয়ে ব্যথা, অনিয়মিত হৃৎস্পন্দন, পিঠের দু'পাশে বা মাঝখানে ব্যথা, মূত্রথলিতে ব্যথা, ডায়রিয়া, অপরিণত বয়সে মাথায় টাক প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়।

CamScanner

৬। **ইস্ট্রোজেন (Estrogen)** : এই হরমোন নারীদেহকে সুস্থ সবল ও সুদর্শন রাখে। এর ক্ষরণ কম হলে ইস্ট্রোজেনবাহী বড়ি বা ইনজেকশন ব্যবহার করা হয়। এর অতিমাত্রায় ব্যবহারে নারীদেহে নানান জটিলতা সৃষ্টি হয়। যেমন– স্তন দৃঢ় হয় এবং অস্বাভাবিক বড় হয়ে যায়, একে **গাইনেকোমাস্টিয়া** (gynecomastia) বলে; অতিরিক্ত রক্তস্রাব হয়, বমি বমি ভাব, মাথাব্যথা, দেহ ও মুখমণ্ডলের ত্বকে ফুসকুড়ি বা বিভিন্ন অংশে **অ্যাকনি** (acne) বা বিশ্রী দাগ পড়ে, মানসিকভাবের পরিবর্তন ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়।

বিভিন্ন অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি তাদের নিঃসৃত হরমোনের সাহায্যে দেহের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তার করে। তাই অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলোর স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা দেহকে সুস্থ ও স্বাভাবিক রাখার জন্য অপরিহার্য। বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় হরমোন খুব সূক্ষ্মমাত্রায় প্রয়োজন হয়। তাই দেহে হরমোনের পরিমাণ তারতম্যে বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় বিশৃঙ্খলা (disorder) সৃষ্টি হয়, যা পরিশেষে বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি করে। উৎস গ্রন্থি ছাড়া দেহের অন্য কোনো স্থানে হরমোন সঞ্চিত থাকতে পারে না। তাই দেহের প্রয়োজন অনুসারে হরমোন ক্ষরিত হয়ে বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া গ্রন্থিগুলো নিয়ন্ত্রণ করে। বিশেষ কোনো কারণে দেহের প্রয়োজন অনুযায়ী এবং যথাসময়ে হরমোন ক্ষরিত না হলে বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় বিঘ্ন ঘটে যার বহিঃপ্রকাশে বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে।

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলোর মধ্যে সমন্বয়সাধন দেহকে সুস্থ ও স্বাভাবিক রাখার জন্য আবশ্যক। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, একটি গ্রন্থির নিঃসৃত হরমোন অন্য একটি গ্রন্থির ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে। এক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণকারী গ্রন্থির বিশৃঙ্খলায় নিয়ন্ত্রক গ্রন্থির কাজে বিঘ্ন ঘটে। অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলোর **অতি সক্রিয়তা** (hyper activity) এবং **স্বল্প সক্রিয়তা** (hypo activity) দেহে সংশ্লিষ্ট হরমোনের পরিমাণের বৃদ্ধি এবং হ্রাস ঘটায়। ফলে বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ার স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়ে যায় এবং বিভিন্ন রোগের উদ্ভব হয়।

হরমোনের অনিয়মিত ক্ষরণজনিত রোগের নাম, কারণ ও লক্ষণের ছক

রোগের নাম	কারণ	রোগ লক্ষণ
১। ডোয়ারফিজম	শৈশবকালে STH-এর কম ক্ষরণের ফলে।	বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, উচ্চতা ৩ ফুটের বেশি হয় না।
২। অ্যাক্রোমিক্রিয়া	প্রাপ্তবয়স্কদের পিটুইটারি ক্ষরণ হ্রাস পেলে।	মুখমণ্ডল, হাত-পা, মেরুদণ্ড ইত্যাদির স্বাভাবিক বৃদ্ধি হয় না।
৩। জাইগ্যানটিজম	শৈশবকালে STH-এর ক্ষরণ বেশি হলে।	অতিরিক্ত দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায় (৭-৮ ফুট)।
৪। অ্যাক্রোমেগালি বা মারিজ ব্যাধি	প্রাপ্তবয়স্কদের STH-এর ক্ষরণ বেশি হলে।	চোয়াল, হাত-পা, মেরুদণ্ড ইত্যাদির অধিক বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়।
৫। সাইমন্ড ব্যাধি	পিটুইটারি গ্রন্থির কার্যকারিতা লোপ পেলে।	দেহের ওজন হ্রাস পায়, খিদে কমে যায়, যৌন ক্ষমতা হ্রাস পায়।
৬। অ্যাডিসন বর্ণিত ব্যাধি	অ্যাড্রিনাল কর্টেক্সের স্বল্পক্ষরণের ফলে।	পেশির দুর্বলতা, রক্তচাপ কমে যাওয়া, ত্বকের বর্ণের পরিবর্তন ইত্যাদি।
৭। কুশিং বর্ণিত ব্যাধি	অ্যাড্রিনাল কর্টেক্সের অতি সক্রিয়তার ফলে।	দেহে অতিরিক্ত মেদ সঞ্চিত হয়। বিশেষ করে মুখমণ্ডল গ্রীবা ও নিতম্বদেশে।
৮। ক্রেটিনিজম	শিশুদের থাইরক্সিন কমে গেলে।	বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, শিশুর মানসিক বিকাশ ঘটে না। যৌন লক্ষণ প্রকাশ পায় না।
৯। মিক্সিডিমা	প্রাপ্তবয়স্কদের থাইরক্সিন ক্ষরণ কমে গেলে।	চোখ-মুখ ফোলা দেখায়, চামড়া পুরু ও খসখসে হয়, জিহ্বা স্থূল, গলার স্বর মোটা হয়ে যায়।
১০। গয়টার বা গ্রেভস বর্ণিত রোগ	থাইরক্সিন ক্ষরণ বেড়ে গেলে।	গলগণ্ড বা থাইরয়েড বৃদ্ধি পায়, চক্ষু বিস্ফোরিত হয়।
১১। টিটেনি	প্যারাথরমোন ক্ষরণ কমে গেলে।	পেশির খিঁচুনি, তড়কা ইত্যাদি।
১২। ডায়াবেটিস মেলিটাস	ইনসুলিনের কম ক্ষরণের ফলে।	রক্তে শর্করার পরিমাণ বেড়ে যাওয়া, মূত্রের সঙ্গে শর্করা নির্গত হওয়া ইত্যাদি।
১৩। ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস	ADH নিঃসরণ কমে গেলে।	বেশি পরিমাণে এবং ঘন ঘন মূত্র ত্যাগ, প্রবল তৃষ্ণা ইত্যাদি।

CamScanner

হরমোনের অনিয়মিত ক্ষরণের প্রভাবজনিত কারণে কতগুলো রোগের বিবরণ

১। বামনত্ব (Dwarfism) : শৈশবে অগ্র পিটুইটারি গ্রন্থির স্বল্প ক্ষরণে (STH-এর ক্ষরণ হ্রাস পাওয়ায়) সামগ্রিকভাবে দৈহিক বৃদ্ধি হ্রাস পায় এবং বৃদ্ধিজনিত একটি রোগের বহিঃপ্রকাশ ঘটে, তাকে বামনত্ব বলে। সাধারণভাবে দেহের বিভিন্ন অংশের বৃদ্ধি সঠিক অনুপাতে হলেও বৃদ্ধির হার মারাত্মকভাবে কমে যায়। যেমন– ১০ বছরের একটি শিশুর দৈহিক বৃদ্ধি ৪ থেকে ৫ বছরের স্বাভাবিক শিশুর সমতুল্য হয়। একই শিশুর ২০ বছর বয়সে যে বৃদ্ধি হয় তা স্বাভাবিক ৭ থেকে ১০ বছরের শিশুর সমতুল্য হয়। বৃদ্ধি হরমোনের স্বল্পতাই এই বৃদ্ধি হ্রাসের মূল কারণ। এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হ্রাসজনিত অবস্থাকে বামনত্ব বলে।

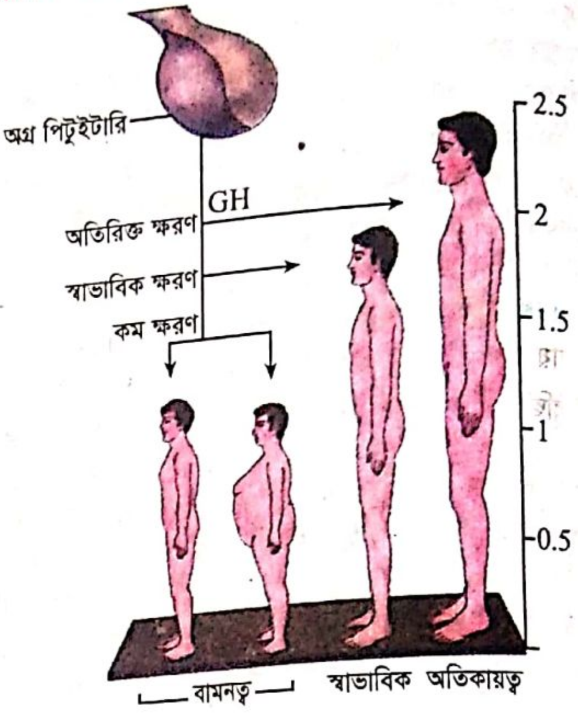

চিত্র ৮. ২৪ক : গ্রোথ হরমোনের স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক ক্ষরণের প্রভাব

২। অতিকায়ত্ব (Gigantism) : পিটুইটারি গ্রন্থির অগ্রখণ্ডের বৃদ্ধি হরমোন (STH) নিঃসরণকারী কোষগ্রন্থিগুলোর সক্রিয়তা বেড়ে যায়, ফলে অতিরিক্ত বৃদ্ধি হরমোন ক্ষরিত হয়। এই অবস্থা যদি বয়ঃসন্ধিকালের পূর্বে হয় তবে দৈহিক বৃদ্ধি অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায় এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উচ্চতা ৮ ফুট পর্যন্ত হয়। এই অবস্থাকে অতিকায়ত্ব বা দৈত্যত্ব বলে। অতিকায় ব্যক্তির রক্তের শর্করার পরিমাণ বেড়ে যায় এবং অগ্ন্যাশয়ের আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স-এর বিটা কোষগ্রন্থিগুলো অধিক ইনসুলিন ক্ষরণজনিত কারণে বিনষ্ট হয়। এর ফলে ডায়াবেটিস মেলিটাস রোগের উৎপত্তি হয়।

চিত্র ৮.২৪খ : মানুষের হরমোন সংক্রান্ত রোগসমূহ– ক. অ্যাক্রোমেগালি, খ. কুশিং সিনড্রোম, গ. ক্রেটিনিজম, ঘ. মিক্সিডিমা, ঙ. স্ফীত নেত্র, গলগণ্ড, গ্রেভ বর্ণিত রোগ ও চ. টিটেনি রোগ।

৩। গরিলাত্ব (Acromegaly) : প্রাপ্ত বয়স্কদের পিটুইটারি গ্রন্থির বেশি হলে চোয়াল, হাত-পা, মেরুদণ্ড ইত্যাদির অধিক বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয় অর্থাৎ অস্থিগুলো প্রস্থে বেড়ে যায় কিন্তু দৈর্ঘ্যে বাড়ে না, এ অবস্থাকে গরিলাত্ব বা অ্যাক্রোমেগালি বলে। এ রোগের ফলে হাত ও পায়ের অস্থিগুলোর স্থূলতা বাড়ে এবং হাতের আঙুলের অস্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য হাতের আকার প্রায় দ্বিগুণ হয়। পায়ের আকার এমন বেড়ে যায় যে, অনেক বড় সাইজের জুতা পরতে হয়। নিচের চোয়াল সামনের দিকে বেড়ে যায়। করোটি, নাক, মাথার অগ্রভাগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নাকের আকার দ্বিগুণ বেড়ে যায়। সর্বশেষ অবস্থায় অনেক কোমল কলা, অঙ্গ যেমন– জিহ্বা, যকৃৎ এবং বৃক্ক মারাত্মকভাবে বেড়ে যায়।

৪। কুশিং সিনড্রোম (Cushing syndrome) : অ্যাড্রিনাল কর্টেক্সের অতি সক্রিয়তার ফলে দেহে বিশেষ করে মুখমণ্ডল, গ্রীবা ও নিতম্বদেশে অতিরিক্ত মেদ সঞ্চিত হয়, এ অবস্থাকে কুশিং সিনড্রোম বলে। এই রোগের ফলে পেশি ক্ষীণ ও শিথিল হয়। রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং ক্ষীণ ও শিথিল হয়। রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং মূত্রে গ্লুকোজ রেচন ঘটে। এ রোগ হলে উদর ঝোলানো হয় এবং ঘা সারতে দেরি হয়।

৫। ক্রেটিনিজম (Cretinism) : ভ্রূণাবস্থায়, কৈশোরে কিংবা শৈশবে থাইরয়েড গ্রন্থির চূড়ান্ত স্বল্প ক্রিয়ায় এ রোগ হয়। এ অবস্থাকে দৈহিক বৃদ্ধি হ্রাস ও মানসিক প্রতিবন্ধকতা দ্বারা চিহ্নিত করা যায়। ক্রেটিনিজম রোগটি জন্মগত থাইরয়েড গ্রন্থির অনুপস্থিতি অথবা থাইরয়েড গ্রন্থির হরমোন ক্ষরণে ব্যর্থতার কারণে হয়ে থাকে। শিশু স্থূলাকৃতি, খর্বাকৃতি ও বলিষ্ঠ হয়। উদর অঞ্চল বেশি স্ফীত হয়। অন্তঃকঙ্কাল বৃদ্ধির তুলনায় জিহ্বা এত লম্বা হয়ে যায় যে, গলাধঃকরণ ও শ্বাসক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করে। মুখ থেকে অনবরত লালা নিঃসরণ ও পেট বড় হয়ে যায়। এতে শিশুর দাঁত ওঠা, কথা বলা, দাঁড়ানো সবই বিলম্বিত হয়। মানসিক বিকাশ সঠিক না হওয়ায় শিশু জড়বুদ্ধিসম্পন্ন এবং মুখমণ্ডলে বোকা ভাব লক্ষ করা যায়।

৬। মিক্সিডিমা (Myxedema) : প্রাপ্তবয়স্ক লোকের থাইরয়েড গ্রন্থির স্বল্প সক্রিয়তার জন্য যে অস্বাভাবিক অবস্থা দেখা যায় তাকে মিক্সিডিমা বলে। এ রোগে অবসাদ ও তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব দেখা যায়। দিনে ১২ থেকে ১৪ ঘণ্টা ঘুম হয়। চুলের বৃদ্ধি কমে যায় এবং ত্বক খসখসে হয়। গলার স্বর ব্যাঙের মতো কর্কশ হয়। মুখমণ্ডল ফুলে যায়।

৭। গয়টার (Goitre) বা গ্রেভ বর্ণিত রোগ (Grave's disease) : থাইরয়েড গ্রন্থির অতি সক্রিয়তার ফলে স্ফীত নেত্রসহ যে অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাকে গ্রেভ বর্ণিত রোগ বলে। থাইরক্সিন হরমোনের অতিক্ষরণের ফলে এ রোগ হয়। এ রোগ হলে ছানাবড়া চক্ষু, থাইরয়েড গ্রন্থির বৃদ্ধি, দেহের দ্রুত ক্ষয় অর্থাৎ ওজন কমে যায়। উত্তেজনা, অনিদ্রা, রুক্ষ ও খিটখিটে মেজাজ হয় এবং আবেগপ্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

৮। টিটেনি (Tetany) : প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থির স্বল্প সক্রিয়তার ফলে ক্যালসিয়াম (Ca^{2+}), সোডিয়াম (Na^{+}) এবং পটাশিয়াম (K^{+}) আয়ন গ্রন্থিগুলোর স্থিতাবস্থা নষ্ট হয়ে যে অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয়, বিশেষ করে ঐচ্ছিক পেশির খিঁচুনি পরিলক্ষিত হয় তাকে টিটেনি বলে। টিটেনি বা ধনুষ্টংকার রোগে মুখমণ্ডলের পেশির দ্রুত সংকোচন ঘটে। হাতের কবজি ও বুড়ো আঙুল বেঁকে যায় এবং আঙুলের বিক্ষেপ ঘটে।

৯। ডায়াবেটিস মেলিটাস বা ডায়াবেটিস (Diabetes mellitus or diabetes) : কোনো কারণে আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্সের বিটা কোষগ্রন্থিগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হলে কিংবা কোনো কারণে এদের কার্যক্ষমতা হ্রাস পেলে অর্থাৎ অভাবে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে কয়েকটি লক্ষণযুক্ত একটি বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাকে ডায়াবেটিস মেলিটাস বলে। এটি ইনসুলিনের কম ক্ষরণের ফল। এ রোগকে অনেকে সকল **'জটিল রোগের জননী'** বলে আখ্যায়িত করেছেন। অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিসের কারণে আমাদের বৃক্ক, যকৃৎ, হৃৎপিণ্ড, চোখ, দাঁত ও স্নায়ুতন্ত্রসহ সকল গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গাদি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। প্রসঙ্গত ADH হরমোনের অভাবে **ডায়াবেটিস ইনসিপিটাস** বা বহুমূত্র রোগ হয়।

রোগের লক্ষণ : (১) প্রস্রাবের সাথে গ্লুকোজ নির্গত হয়, (২) অতি ক্ষুধা এবং অতি তৃষ্ণা, (৩) শরীর রোগা, দুর্বল ও অবসন্ন হয়ে থাকে।

রোগের চিকিৎসা : ইনসুলিনের সাহায্যেই এ রোগের চিকিৎসা করা হয়ে থাকে। রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে মূত্রের সাথে গ্লুকোজ নির্গত হলে একে **গ্লাইকোসুরিয়া (gluycosuria) বলে**।

অন্যদিকে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বৃদ্ধিকে **হাইপারগ্লাইসেমিয়া** (hyperglycemia) বলে। কোনো কারণে ইনসুলিনের ক্ষরণ বৃদ্ধি পেলে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা হ্রাস পেয়ে এক বিশেষ লক্ষণযুক্ত অবস্থার সৃষ্টি হয়, একে **হাইপোগ্লাইসেমিয়া** (hypoglycemia) বলে। হাইপোগ্লাইসেমিয়া হলে শারীরিক অবসাদ, তড়কা, রুক্ষ মেজাজ এবং চৈতন্য লোপ পায়।

> ❑ **কাজ :** (i) অনিয়ন্ত্রিত হরমোন ক্ষরণ হলে যে সকল সমস্যা দেখা দিতে পারে তা বিশ্লেষণ কর। (ii) হরমোনের গুরুত্ব উল্লেখ কর। (iii) দৈহিক বৃদ্ধি সাধনে হরমোনের কার্যপদ্ধতি বর্ণনা কর। (iv) হরমোনের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার ভয়াবহ হতে পারে– বিশ্লেষণ কর। (v) একই বয়সের দুই মানুষের দৈহিক ও মানসিক বিকাশ স্বাভাবিক হলেও কী কী গঠনগত পার্থক্য থাকতে পারে বলে তুমি মনে কর? (vi) মানুষের স্বাভাবিক দৈহিক ও মানসিক গঠনের জন্য দায়ী হরমোনসমূহের কার্যকারিতা ব্যাখ্যা কর।

CamScanner